

# সূরা মারইয়াম-১৯

## (হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

### অবতীর্ণ হওয়ার তারিখ ও প্রসংগ

হযরত মুহাম্মদ (সা:) এর সাহাবাগণের সর্ববাদীসম্মত অভিতম হলো, আলোচ্য সূরাটি মক্কী জীবনের গোড়ার দিকে, খুব সম্ভবত নবুওয়তের চতুর্থ বৎসরের শেষ দিকে এবং আবিসিনিয়ার হিজরতের পূর্বে, যা হিজরী ৫মে বৎসরের রজব মাসে সংঘটিত হয়েছিল-তার মধ্যবর্তী সময়ে অবতীর্ণ হয়েছিল। পূর্ববর্তী সূরা বনী ইস্রাইল ও আল্লাহকের সাথে এই দিক দিয়ে বর্তমান সূরাটির সম্পর্ক রয়েছে যে উল্লেখিত দুটি সূরাতেই ইহুদী এবং খৃষ্টানের উত্থান ও সাফল্যের কিছু বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছিল, যার ধারাবাহিকতা আলোচ্য সূরাতেও বিদ্যমান। সূরা বনী ইস্রাইলে বিশেষভাবে বর্ণিত হয়েছিল, ইহুদীরা জাতীয় পর্যায়ে দুবার বিপর্যয়ের সম্মুখীন হবে এবং দুবার তারা আবার সাফল্য ও ক্ষমতার অধিকারী হবে। অনুরূপভাবে ইঙ্গিত দেয়া হয়েছিল, মুসলমানরাও দুবার জাতীয় পর্যায়ে ক্ষমতা ও সাফল্যের অধিকারী হবে এবং দুবার ইহুদীদের মত তারাও অবনতি এবং পতনের সম্মুখীন হবে। সূরা কাহফে এই বিষয়টিই আরো বিস্তৃত পরিসরে আলোচিত হয়েছিল যে মৃসারী শরীয়তের মসীহ অর্থাৎ ঈসা (আ:) এর অনুসারী কর্তৃক এক সময় মুসলমানরা জাতীয় বিপর্যয়ের সম্মুখীন হবে, যখন তারা ইসলামী শরীয়তের মসীহ নেতৃত্বে পুনরায় তাদের হারানো গৌরব ফিরে পাবে। বর্তমান সূরাতে পূর্বপ্রসঙ্গের সূত্র ধরে খৃষ্টীয় বিশ্বাসের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। এই দিক থেকে আলোচ্য সূরাটি একই শ্রেণীর বক্তব্যসমূহ তত্ত্বাত্মক সংযোজন যার প্রথম দুটি সূরা বনী ইস্রাইল ও সূরা কাহফ। মূলত এই তিনটি সূরা একই বিষয়বস্তু আলোচনা করেছে এবং উপস্থাপনার দিকে থেকে একই ধরনের প্রকাশতত্ত্বী অনুসরণ করেছে।

### বিষয়বস্তু

সূরাটির শুরুতে যে সংক্ষিপ্ত বর্ণনালা বা “হুরাফে মুকাভায়াত” রয়েছে, তার মাধ্যমে ইসলামী শিক্ষা ও খৃষ্টীয় বিধিব্যবস্থার মধ্যে একটি তুলনামূলক চিত্র প্রদান করা হয়েছে এবং এই সত্যের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে যে খৃষ্টীয় বিধান ছিল মূলত ঐশ্বী, কিন্তু পরবর্তীতে এর মধ্যে আন্ত বিশ্বাস ও মতবাদ প্রক্ষিপ্ত হয়েছে। যেহেতু এই সব প্রক্ষিপ্ত মতবাদ ঐশ্বী গুণাবলীর সাথে বৈসাদৃশ্যপূর্ণ, তাই সেগুলো খন্দন করার লক্ষ্যে হযরত ঈসা (আ:) এর সংক্ষিপ্ত জন্মবৃত্তান্ত বর্ণনা করা হয়েছে। অবশ্য হযরত ঈসা (আ:) এর জন্ম বৃত্তান্ত বর্ণনা করার পূর্বে হযরত যাকারিয়া (আ:) এর প্রসঙ্গেও কিছুটা বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। কেননা বাইবেলের ভবিষ্যত্বাণী অনুযায়ী সদাশুভ্র সেই মহৎ ও তয়ক্ষেত্রে দিন আসার পূর্বে এলীয় ভাববাদীর প্রেরিত হবার কথা (মালাকি-৪:৫)। আর ইহুদীরা যখন এলীয় সম্পর্কে হযরত ঈসা (আ:) এর নিকট জানতে চেয়েছিল, মনুষ্য-পুত্রের আগমন হওয়ার পূর্বেই যার আগমন আবশ্যিক, তখন তিনি বলেছিলেন, “তোমরা যদি গ্রহণ করিতে সম্মত হও তবে জানিবে, যে এলীয়ের আগমন হইয়াছে তিনি এই ব্যক্তি, অর্থাৎ যোহনেই এলীয়।” “এলীয়ের শক্তি ও প্রকৃতি প্রাপ্ত হয়ে যোহন এসেছেন” (মথি-১১:১৪-১৫, ১৭:১২ ও মার্ক ১৪:৩)। তিনি ইহুদীদেরকে আরো বলেছিলেন, এলীয় স্বর্গ থেকে আসবেন না, বরং অন্যান্য সকল মানুষের মত তিনিও এক মায়ের গর্ভে জন্মহাহণ করবেন অন্য একজন মানুষের আকৃতিতে এবং তিনিই যোহন (মথি-১১:১ ও লুক-৭:২৮)।

অতঃপর হযরত ঈসা (আ:) এর প্রসঙ্গ বর্ণনায় এই সূরাটি তাঁর জন্ম যে এক অসাধারণ প্রক্রিয়ায় পিতার মাধ্যম ছাড়াই সম্পন্ন হয়েছে তার উল্লেখ করেছে। এই অতি অসাধারণ ঘটনা অবলম্বন করার পিছনে যে ইঙ্গিত রয়েছে তাহলো, নবুওয়তের ধারা বনী ইস্রাইলে স্থানান্তরিত হতে যাচ্ছে। কেননা বনী ইস্রাইল তথা ইস্রাইলে জাতির মধ্যে এমন কোন পুরুষ বর্তমান নেই যার ওরসে আল্লাহর কোন নবী জন্ম লাভ করতে পারেন। অতঃপর সূরাটিতে হযরত ঈসা (আ:) এর স্তর্ঘনাত্মক কথিত দাবীকে এই যুক্তি দ্বারা খণ্ডন করা হয়েছে যে হযরত আদম (আ:) থেকে শুরু করে হযরত ঈসা (আ:) এর পূর্ব পর্যন্ত সকল নবীই যখন মানুষ ছিলেন তখন হযরত ঈসা (আ:), যিনি নিজেও একজন নবী। তিনি কি করে মানুষ ছাড়া অন্য কিছু হতে পারেন এবং কেনই বা তাঁর প্রতি স্তর্ঘনাত্মক বা খোদার পুত্রের ঐশ্বী গুণাবলী আরোপ করা যেতে পারে? যেহেতু খৃষ্টান জাতি কর্তৃক আখেরী যামানায় পুনরুত্থান ও মৃত্যুর পরবর্তী জীবন সম্পর্কে ব্যাপকভাবে অস্বীকৃতি প্রকাশ পাবে এবং যেহেতু এই সূরাটিতে খৃষ্টীয় মতবাদ সম্পর্কে বিশেষভাবে আলোকপাত করা হয়েছে, সেহেতু এই সূরার পরবর্তী আলোচ্য বিষয় হলো মৃত্যুর পরবর্তী জীবন। এই বিষয়ে সূরাটিতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ যুক্তির অবতারণা করা হয়েছে যার মোকাবিলায় অবিশ্বাসীদের বিভিন্ন মামুলি ও অসার যুক্তিসমূহ উন্মোচিত ও খণ্ডিত হয়ে গিয়েছে। সূরাটিতে বলা হয়েছে যে

অবিশ্বাসীরা তাদের জাগতিক সম্পদ, বস্তু-সম্ভাবন ও অধিক সংখ্যা দেখিয়ে এক ধরনের অমূলক আনন্দের মধ্যে থাকে এবং এইসব জিনিষকে মৃত্যুর পরবর্তী জীবন সম্পর্কে তাদের অবিশ্বাসজনিত মিথ্যা ধারণার অনুকূলে বলে যুক্তি প্রদর্শন করে এবং তাদের আত্মপক্ষ সমর্থনে বলতে থাকে, ইহজীবন ছাড়া আসলে আর কোন জীবন নেই। তাদেরকে সতর্ক করে বলা হয়েছে, বিশ্বাসীদের আপাত সংখ্যালভতা ও সম্পদহীনতা এবং তাদের নিজেদের ইহজাগতিক প্রাচুর্য, ক্ষমতা ও সম্পদ দেখিয়ে তারা যেন এই কপট ধারণার বশবর্তী হয়ে না পড়ে যে চিরকাল অবস্থা এমনই থাকবে। বরং আসল কথা হলো, সত্য ধীরে ধীরে ও ধাপে ধাপে অগ্রসর হয় এবং এটা অবধারিত, পরিণামে সত্যই বিজয়ী হয়। পরিশেষে একটি ইঙ্গিতপূর্ণ প্রশ্নের জবাব দানের মাধ্যমে এই সূরার পরিসমাপ্তি টানা হয়েছে আর প্রশ্নটি হলো—আরবী ভাষাকে কেন কুরআন শরীফের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে? উত্তরে বলা হয়েছে, যেহেতু আরববাসীদের উদ্দেশ্যেই কুরআনের প্রথম সঙ্গোধন, সেহেতু এটাই স্বাভাবিক ও যুক্তিসংগত যে কোন বাণী সেই ভাষাতেই কোন সম্প্রদায়ের নিকট প্রচারিত হওয়া উচিত যার মাধ্যমে তারা নিজেরা ভাব বিনিময় করে। এতে তাদের পক্ষে উক্ত বাণীর বিষয়বস্তু অনুধাবন ও পারস্পরিক মত বিনিময় করা সহজ হয়ে পড়ে এবং এজন্যই কুরআন শরীফ আরবী ভাষায় অবরুদ্ধ হয়েছে।

## সূরা মারহিয়াম-১৯

ମର୍କୀ ସୁରା, ବିସମିଲାହ୍ସହ ୯୯ ଆୟାତ ଏବଂ ୬ ରଙ୍କୁ

- ১। ক্ষেত্রাল্লাহ্‌র নামে, যিনি পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী (ও) বার বার কৃপাকারী ।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ①

- ২। আনতা কাফিন ওয়া হাদিন, ইয়া ‘আলিমু ইয়া সাদিকু’<sup>১৯৩</sup> অর্থাৎ তুমি যথেষ্ট, সত্য পথনির্দেশক, হে জ্ঞানী, হে সত্যবাদী।

كَلِمَاتٌ مُّعْصَمٌ

- ৩। এ হলো তোমার প্রত্যু-প্রতিপালকের (সেই) কৃপার বর্ণনা, যা তিনি তাঁর বান্দা যাকারিয়ার<sup>১৭৩</sup> প্রতি করেছিলেন

ذِكْرُ ذَخْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَاً

- ৪। যখন সে তার প্রভু-প্রতিপালককে নিভ্রে  
ডেকেছিল ১৯৮০।

رَأْذٌ نَّاكِدٌ رَّبَّهُ نِدَّاءٌ خَفِيَّاً ⑥

ଦେଖୁନ : କ. ୧୦୧ ଖ. ୩୯୩୯; ୨୧୦୯୦ ।

১৭৩৮। উম্মে হানি (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে হ্যরত রসূল করীম (সাঃ) বলেছিলেন, সংযুক্ত বর্ণ ‘কাফ হা ইয়া আইন সাদ’ সমূহে ‘কাফ’ দ্বারা কাফিন (পর্যাণ, যথেষ্ট), ‘হা’ দ্বারা হাদিস (সত্য পথ নির্দেশক), ‘আইন’ দ্বারা ‘আলীম (সর্বজ্ঞ) এবং ‘সাদ’ দ্বারা সাদেক’ (সত্যবাদী) বুঝায়। অতএব এই সংযুক্ত অক্ষরগুলোর পঠন হয়ঃ ‘আনতা কাফীন আনতা হাদীন ইয়া আলীমু ইয়া সাদিকু’ অর্থাৎ তুমই যথেষ্ট, সকলের প্রয়োজন সাধনে সক্ষম, তুমি সত্য পথপ্রদর্শক, হে সর্বজ্ঞ হে সত্যনিষ্ঠ! আল্লাহ্ তাআলার চারটি সিফত, যা এই সংযুক্ত বর্ণমালায় পরিস্ফুটিত হয়েছে তা খৃষ্টানদের প্রায়শিত্ববাদের অসারতা উন্মোচন ও প্রত্যাখ্যান করেছে এবং ফলে এই মতবাদ মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। এতে যীশুর ঈশ্বরত্ব তথা ত্রিতুলী ধর্মমতের সম্পূর্ণ অস্তিত্বই চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায়। উক্ত চারটি গুণের মধ্যে আলীম এবং সাদিক এই দুটি প্রধান এবং মৌলিক গুণ এবং কাফী ও হাদী তাদের অধীন ও প্রথমোচ্চ সিফত থেকে নির্গত এবং ওদেরই অবশ্যিক্তবী বিকাশ এবং প্রতিফলন। যদি আল্লাহ্ তাআলা আলীম (সর্বজ্ঞ) হন তাহলে প্রায়শিত্ববাদী মতের কোন স্থান থাকে না। কারণ এই মতবাদ পূর্বাহৈই মেনে নেয় যে আল্লাহ্ তাআলা বিশ্ব সম্পর্কিত বিষয়াদি পরিচালনার জন্য এক বিশেষ কর্মসূচীর পূর্ব-পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু তাঁর জ্ঞান ক্রটিপূর্ণ হওয়ায় তাঁর পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়েছিল এবং সেই কারণে আল্লাহ্ তাআলা পৃথিবীর রক্ষাকল্পে তাঁর নিজ পুত্রকে কুরবানী করতে বাধ্য হয়েছিলেন। আল্লাহ্ তাআলার পরিকল্পনার ব্যর্থতা তাঁর ‘সর্বজ্ঞ’ হওয়া গুণের বিসদৃশ বা বিরুদ্ধ এবং যখন আল্লাহ্ তাঁর জ্ঞানকে ক্রটিপূর্ণ দেখানো হয় তখন তিনি কাফী অর্থাৎ যথেষ্ট বা পরিপূর্ণ বলে দাবী করতে পারেন না। কারণ যে সত্তা সর্বজ্ঞ (আলীম) তিনি নিশ্চিত ও অনিবার্যভাবেই পর্যাণ, পরিপূর্ণ এবং যথেষ্ট। একইরূপে সাদিক গুণ এবং এর অধীনস্থ হাদী (পরিচালক বা হেদয়াতকারী) প্রায়শিত্ববাদ ধর্মমতকে চূর্ণ করে ফেলে। যদি আল্লাহ্ তাআলা প্রকৃতই হাদী বা পরিচালক না হন এবং পাপীদের জন্য যীশুর প্রায়শিত্বে বিশ্বাস না করলে নাজাত ও মৃত্তি যদি সম্ভব না হয় তাহলে স্থীকার করে নিতে হবে, আল্লাহ্ তাআলার সকল নবী-রসূলই মিথ্যাবাদী এবং প্রতারক (নাউয়ুবিল্লাহ)। কারণ তাঁরা খৃষ্টীয় বিশ্বাসের বিপরীত শিক্ষা দিতেন এবং প্রচার করতেন যে মৃত্তি এবং নাজাত কেবল সত্য দৈমান এবং সৎকর্মের মাধ্যমেই সম্ভব এবং আল্লাহ্ তাআলার প্রত্যাদিষ্ট নবী-রসূলগণের সত্যবাদিতাই হাদী অর্থাৎ সত্য-পরিচালক হওয়া প্রমাণ করে। এরপে উক্ত বর্ণমালাগুলোর সংক্ষিপ্ত সংযুক্তি এই ইঁগিতই করে, খৃষ্টানদের ধর্মবিশ্বাস ও মতবাদের সঠিক পর্যালোচনায় এটাই সাব্যস্ত হয়, এই সমস্ত অসমর্থিত মতবাদ যুক্তির ধোপে ঢিকে না এবং তা তাদেরকে উত্তমরূপে উপলব্ধি করাবার শ্রেষ্ঠ পথা হচ্ছে আল্লাহ্ তাআলার সিফতসমূহের উপরে বিস্তারিত আলোচনা করা, চিন্তা করা বিশেষভাবে উপরোক্ত চারটি গুণ সংযুক্তে। মুকাভায়াতের উপর বিস্তারিত আলোচনার জন্য ১৬ টাকা দেখুন।

୧୭୩୯ । ଟ୍ରେସା (ଆଶ) ଏର ସମ୍ବନ୍ଧେ ଆଲୋଚନାର ପୂର୍ବେ ହ୍ୟରତ ଯାକାରିଯା (ଆଶ) ସମ୍ପର୍କେ ଆଲୋଚନା ଥାଣ ପେଯେଛେ । କାରଣ ଯାକାରିଯା (ଆଶ) ଏର ପୁତ୍ର ଇୟାହ୍ତ୍ଯା (ଆଶ) (ବ୍ୟାପ୍ଟିଟ୍ ଯୋହନ) ହ୍ୟରତ ଟ୍ରେସା (ଆଶ) ଏର ଅଧିଦୂତ ଛିଲେନ । ତିନି ଇହୁଦୀ ଜାତିକେ ସୁସଂବାଦ ଦେଯାର ଜନ୍ୟ ହ୍ୟରତ ଟ୍ରେସା (ଆଶ) ଏର ଆବିର୍ଭାବେର ବାର୍ତ୍ତା ଘୋଷଣା କରେଛିଲେନ ସେ ତାଦେର ଉଦ୍ଧାରକାରୀର ଆଗମନ ଆସନ୍ନ ପ୍ରାୟ (ମାଲାକି-୪୮୫) । ମାଲାକି ନବୀର ଭବିଷ୍ୟଦ୍ଵାଣୀ ଅନୁଯାୟୀ ଟ୍ରେସା (ଆଶ) ଏର ପୂର୍ବେ ଇଲିଆସ ନବୀର ଆଗମନେର କଥା । କୁରାଆନ କରୀମେ ହ୍ୟରତ ଟ୍ରେସା (ଆଶ) ଏର ବର୍ଣନା ଦିତେ ଗିଯେ ଇଲିଆସଙ୍କପେ ଆଗମନକାରୀ ହ୍ୟରତ ଇୟାହ୍ତ୍ଯାର (ଯୋହନ) ଉଲ୍ଲେଖ ବିଷୟବସ୍ତୁର ଜନ୍ୟ ଖୁବଇଁ ସମ୍ମିଳିତ ଓ ସଥାର୍ଥ ହେଯେଛେ ।

୧୭୪୦ । ଆଲ୍ଲାହୁତାଆଲାର ପ୍ରେରିତ ନବୀଗଣକେ ବାରବାର ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରାଯାଇଛନ୍ତି ଜାତିର ପ୍ରତି ବାଇବେଳେର ଭୟବ୍ୟାଧାଣୀ ଓ ଶ୍ରୀ-ଶ୍ରୀଭୂଷିତାରୀ ଥେବେ

৫। সে বলেছিল, ‘হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! নিশ্চয় আমার হাড়গোড় দুর্বল হয়ে পড়েছে এবং বার্ধক্যের দরুন আমার মাথার চুল উজ্জ্বল-শুভ হয়ে গেছে। হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! এরপরও তোমার কাছে দোয়া করে আমি কখনো ব্যর্থ হইনি।

৬। আর নিশ্চয় আমি আমার (মৃত্যুর) পর আমার আত্মীয়-স্বজনদের (আচরণ) সম্পর্কে ভয় করি। (অপরদিকে) আমার স্ত্রী বন্ধ্যা। সুতরাং তুমি তোমার পক্ষ থেকে আমাকে একজন উত্তরাধিকারী দান কর<sup>১৪১</sup>,

৭। যে আমার উত্তরাধিকারী হতে পারে এবং ইয়াকুবের বংশধরদের উত্তরাধিকারীও হতে পারে। আর হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! তাকে তুমি (তোমার) অত্যন্ত সন্তোষভাজন করো’।

৮। (আল্লাহ্ বললেন,) ‘হে যাকারিয়া! নিশ্চয় আমরা তোমাকে এক মহান পুত্রের সুসংবাদ দিচ্ছি। তার নাম হবে ইয়াহহীয়া। এর পূর্বে আমরা তার নামে কারো নাম রাখিনি’<sup>১৪২</sup>।

৯। সে বললো, ‘হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! কিরণে আমার পুত্র হবে অথচ আমার স্ত্রী বন্ধ্যা এবং আমিও বার্ধক্যের চরম সীমায় পৌঁছে গেছি’<sup>১৪৩</sup>,

দেখুন ৪ ক. ৩৪৪১ খ. ৩৪৪১; ২১৪১ গ. ৩৪৩৯; ২১৪১ ঘ. ৩৪৩৯ ঙ. ৩৪৪০; ২১৪১ চ. ১৯৬৬ ছ. ৩৪৪১; ২১৪১।

হযরত যাকারিয়া (আঃ) বুঝতে পেরেছিলেন, নবুওয়তের ধারা শীষ্ট ইসহাকের বংশ থেকে হযরত ইসমাইলের বংশে স্থানান্তরিত হয়ে যাবে। এজন্য তিনি (যাকারিয়া) তাঁর অনুভূতি প্রকাশে এক ধার্মিক পুত্রের জন্য প্রার্থনা করলেন।

১৪১। হযরত যাকারিয়া (আঃ) এর দোয়া ছিল পূর্ণ ও সফল প্রার্থনার সকল উপাদানে ভরপুর। গ্রহণযোগ্য দোয়া বিনয়ের সঙ্গে ঐকান্তিকভাবে, একথিতে করা উচিত। প্রার্থনাকারীর নিজের অসহায় অবস্থা এবং দুর্বলতা স্বীকার করা উচিত। দোয়াকারীর অন্তরে অটল বিশ্বাস থাকতে হবে, আল্লাহ্ তাআলা দোয়া করুল করার ক্ষমতার অধিকারী। হযরত যাকারিয়া (আঃ) এর প্রার্থনা এই শর্তগুলো পূরণ করেছিল।

১৪২। ‘সামীয়া’ অর্থ বৈশিষ্ট্য বা মহত্ব বা মর্যাদায় প্রাধান্যের জন্য প্রতিযোগী বা প্রতিদ্বন্দ্বী, সদৃশ্য বা সমতুল্য, অন্যের সমনামধারী ব্যক্তি (লেইন)। এই আয়াতের অর্থ এমন নয় যে হযরত ইয়াহহীয়ার জন্য সমনামধারী কোন ব্যক্তি তাঁর পূর্বে ছিল না। বাইবেল থেকে প্রতিপন্থ হয়, তাঁর পূর্বে যোহন নামের বিভিন্ন ব্যক্তি ছিল (২ রাজাবলী-২৫:২৩, ১-বংশাবলী-৩:১৫, ইয়া-৪:১২)। এর অর্থ এমনও করা যায় যে তিনি সকল বিষয়ে তুলনাবিহীন এবং অসমকক্ষ ছিলেন। তিনি নিজেই স্বীকার করেন, ‘যিনি আমা অপেক্ষা শক্তিমান, তিনি আমার পশ্চাত আসিয়াছেন, আমি হেঁট হইয়া তাহার পাদুকার বন্ধন খুলিবার যোগ্য নই’ (মার্ক-১:৭)। এই আয়াতের মর্ম কেবল এটাই যে হযরত ইয়াহহীয়া বা যোহন শুধু এই বিষয়ে অতুলনীয় ছিলেন যে তিনিই প্রথম নবী যিনি অন্য নবীর অর্থাৎ ইসা (আঃ) এর অগ্রদূতরূপে আগমন করেছিলেন এবং তিনি তুলনাবিহীন ছিলেন এই ব্যাপারেও যে হযরত ইয়াহহীয়া প্রথম নবী যিনি অন্য এক নবীর (অর্থাৎ ইলিয়াস নবীর) আঘ্যিক শক্তি ও মেয়াজের সাদৃশ্যরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন।

১৪৩। আল্লাহ্ তাআলা যাকারিয়ার প্রতি যে মহা অনুগ্রহ করতে যাচ্ছেন, সেজন্য এই আয়াত তাঁর (আঃ) নির্দোষ ও স্বতঃকৃত বিস্ময় প্রকাশ করার প্রতি নির্দেশ করছে। কোন ব্যক্তি যাকারিয়া (আঃ) এর ন্যায় অবস্থায় উপনীত হলে তার জন্য এইরূপ অস্বাভাবিক শুভ সংবাদের প্রতি বিস্ময় প্রকাশ করা ছিল একটি স্বাভাবিক বিষয়।

قَالَ رَبِّيْ رَبِّيْ وَهَنَّ الْعَظِمُ مِنْيَ وَ  
اَشْتَعَلَ الرَّاسُ شَيْئًا وَ لَمْ اَكُنْ  
بِّدْعَائِكَ رَبِّ شَيْئًا①

وَإِنِّي خَفَتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَاءِي  
وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ  
لَدْنَكَ وَلِيًّا①

بَرِّشَنِي وَبَرِّثُ مِنْ أَلِ يَغْنُوبَ وَ  
اجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا①

بِرْ كَرِّيَا إِنَّا بِشَرِّكَ بِعَلْمٍ بِاسْمِهِ يَحْبِي  
لَمْ تَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلِ سَمِيًّا①

قَالَ رَبِّيْ اَنِّي يَكُونُ لِي عُلْمٌ وَكَيْتَ  
امْرَأَتِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنْ الْكِبَرِ  
عِتْيَي়া①

১০। সে (অর্থাৎ ফিরিশ্তা) বললো, ‘এভাবেই (হবে)’। তোমার প্রভু-প্রতিপালক বলছেন, ‘এ (কাজ) আমার জন্য সহজ। এর পূর্বে আমি তোমাকেও সৃষ্টি করেছিলাম যখন তুমি কিছুই ছিলে না’।

১১। সে (অর্থাৎ যাকারিয়া) বললো, ‘হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! আমাকে কোন নির্দশন দাও’। তিনি বললেন, ‘তোমার জন্য নির্দশন<sup>১৪৪</sup> হলো, তুমি লোকদের সাথে ক্রমাগত খ্তিন রাত (ও তিন দিন) কথা বলবে না।’

১২। এরপর সে মেহরাব (অর্থাৎ ইবাদতকক্ষ) থেকে বের হয়ে তার জাতির সামনে এল এবং ইঙ্গিতে<sup>১৪৫</sup> তাদের বললো, ‘তোমরা “সকালসন্ধ্যা (আল্লাহর) পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করতে থাক”।

১৩। (আল্লাহ বললেন,) ‘হে ইয়াহ্বীয়া! তুমি এই কিতাবকে দৃঢ়ভাবে ধর। আর আমরা তাকে বাল্যকালেই প্রজ্ঞা দান করেছিলাম

১৪। এবং আমাদের পক্ষ থেকে কোমলতা আর পবিত্রতা ও (দান করেছিলাম)। আর সে ছিল মুত্তাকী।

১৫। আর (সে) পিতামাতার প্রতি সদাচারী ছিল এবং কখনো উগ্র (ও) অবাধ্য ছিল না।

১। ১৬। ‘আর তার প্রতি শান্তি (বর্ষিত হয়েছিল) যেদিন সে [১৬] জন্মেছিল এবং (সে দিনও তার প্রতি শান্তি বর্ষিত হবে) যেদিন ৪ সে মারা যাবে আর যেদিন তাকে পুনর্গঠিত করা হবে’<sup>১৪৬</sup>।

قَالَ كَذِلِكَ جَقَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيْهِ هَمِينَ  
وَقَدْ حَلَقْتَ مِنْ قَبْلٍ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا<sup>⑩</sup>

قَالَ رَبِّي إِنِّي مَجَعَلُ لَيْلَةً أَيْسِكَ  
أَلَا تَكِلِمَ النَّاسَ ثُلَثَ لَيَالٍ سَوِيًّا<sup>⑪</sup>

فَخَرَجَ عَلَى قَوْمٍ مِنَ الْمُحْرَابِ فَأَوْحَى  
إِلَيْهِمَا أَنْ سَيِّمُوا بَشَرَةً وَعَشِيًّا<sup>⑫</sup>

يَنْهَى خُذِ الْعِكْبَرَ يُقْوَةً وَأَتَيْنَاهُ  
الْحُكْمَ صَبِيًّا<sup>⑬</sup>

وَهَنَانَأَتِنَ لَهُ نَارَ زَكْوَةً وَكَانَ تَقِيًّا<sup>⑭</sup>

وَبَرَّأَ بِالْدَيْنِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَارًا عَصِيًّا<sup>⑮</sup>

وَسَلَمَ عَلَيْهِ يَوْمَ وِلَادَةِ يَوْمَ يَمْوَثَ وَ  
يَوْمَ يُنْعَثُ حَيَّا<sup>⑯</sup>

দেখুন : ক. ৩৪১, ৪৮; ১৯৪২; ৫১৩১ খ. ৩৪২; ৩০৪৩ ঘ. ৬১৫২; ১৯৪৩; ২৯৪৯; ৩১৪১; ৪৬১৬ ঙ. ১৯৩৪।

১৭৪৪। কথা বলা থেকে বিরত থাকা এবং আল্লাহ তাআলার স্মরণে ও প্রশংসায় নিবিষ্ট থাকার জন্য যাকারিয়া (আঃ) এর প্রতি এই নির্দেশ তাঁর নিঃশেষিত দৈহিক শক্তি পুনরুদ্ধার করার জন্য এক আধ্যাত্মিক উপায়স্বরূপ ছিল। বাইবেলের নতুন নিয়মে উল্লেখিত মতে খোদার কথায় অবিশ্বাস করার শান্তিস্বরূপ তাঁর বাক্ষক্তি রহিত হয়েছিল (লুক-১:২০-২২)। কিন্তু তা ঠিক নয়।

১৭৪৫। ‘আওহা ইলা ফুলানিন’ অর্থ সে প্রকাশ করল বা আদেশ দিল বা অঙ্গভঙ্গি বা সঙ্কেত দ্বারা অনুরোধ করলো অথবা সে তাকে এমনভাবে বললো যে অন্যেরা শুনতে পারলো না (আকরাব)। এ প্রসঙ্গে সুরা আলে ইমরানের ৪২নং আয়াতে ‘রাময়’ ওষ্ঠ সংগ্রামনে যোগাযোগ স্থাপন করা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, কঠ ব্যবহারে নয়।

১৭৪৬। ইসলাম তার অভ্যর্থনার প্রথম কয়েক শতাব্দীতে অতি দ্রুত উন্নতি করেছিল। প্রত্যেক ধর্মতরে লোকদের মধ্য থেকে বহুসংখ্যক লোক-বিশেষভাবে খৃষ্টানদের বিরাট দল ইসলাম ধর্মে প্রবেশ করেছিল। তারা ঈসা (আঃ) সম্বন্ধে তাদের ভ্রান্তাক বিশ্বাস সঙ্গে নিয়েই এসেছিল। যেহেতু ইসলাম ধর্মের প্রকৃত শিক্ষা ও মর্ম তখনো তারা উপলব্ধি করে উঠতে পারেনি, সেহেতু ধর্মান্তরিত হওয়ার পরবর্তীকালে তাদের মিথ্যা ধারণা ও ভুল বিশ্বাস মুসলিম সাহিত্যে অনুপ্রবেশ করেছিল। ফলে পরবর্তী কালে তা মুসলমানদের বিশ্বাসে প্রক্ষিপ্ত হয়ে গিয়েছিল। এই সকল বিশ্বাস বা ধারণা উত্তর করা হয়েছিল ঈসা (আঃ)কে অসাধারণ ব্যক্তিত্বে ভূষিত করার উদ্দেশ্যে-এমন ব্যক্তিত্বে যা মানবের গভীর উর্ধ্বে। হ্যরত ঈসা (আঃ) সম্পর্কে অজ্ঞতাপূর্ণ এই সমস্ত বিশ্বাস কুরআন করীম তফসীরাধীন এই সুরায় চূর্ণবিচূর্ণ করে দিয়েছে। এই সুরা এবং সুরা আলে ইমরান হ্যরত ইয়াহ্বীয়া এবং ঈসা (আঃ) এর মধ্যে তুলনা করে দেখিয়ে দিয়েছে,

টীকার অবশিষ্টাংশ পরবর্তী পঢ়ায় দ্রষ্টব্য

১৭। আর এ কিতাবে তুমি মরিয়ম সম্পর্কে বর্ণনা কর। (স্বরণ কর) সে যখন তার পরিবারপরিজন থেকে পৃথক হয়ে পূর্বদিকে এক স্থানে চলে গেল<sup>১৪৭</sup>,

وَإِذَا كُزْفَ الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذَا اتَّبَعَتْ  
مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرَقِيًّا<sup>⑭</sup>

১৮। এরপর সে নিজের ও তাদের মাঝে পর্দা টেনে দিল। তখন আমরা আমাদের কংফিরিশ্তাকে<sup>১৪৮</sup> তার কাছে পাঠালাম এবং সে তার সামনে এক সুস্থসবল মানুষের আকার ধারণ করলো<sup>১৪৯</sup>।

فَاتَّبَعَتْ مِنْ دُوْنِهِمْ حِجَابًا تَسْ  
فَازَ سَلَنَاتٍ لَّيْهَا رُؤْحَنَ فَتَمَثَّلَ لَهَا  
بَشَرًا سَوِيًّا<sup>⑮</sup>

১৯। সে (অর্থাৎ মরিয়ম) বললো, ‘তুমি তাকওয়াপরায়ণ হয়ে থাকলে আমি অবশ্যই তোমা থেকে রহমান (আল্লাহর) আশ্রয় প্রার্থনা করি<sup>১৫০</sup>।’

قَالَتِ إِلَيْيَ آغْوَذْ بِالرَّحْمَنِ مِثْكَرَانِ  
كُنْتَ تَقْرِيًّا<sup>⑯</sup>

দেখুন ৪ ক. ৩৪৪৩।

হযরত ঈসা (আঃ) এর মধ্যে এমন কোন কিছুই ছিল না যা তাঁকে অন্যান্য সকল নবী থেকে পৃথক করে দিয়েছিল (দেখুন দি লারজার এডিশন অব দি কমেন্টারী, পঃ ১৫৬৫)।

১৭৪৭। পরবর্তী কয়েক আয়াতে হযরত ঈসা (আঃ) এর বিনা পিতায় জন্মগ্রহণ সম্পর্কে কিছু বিস্তারিত বর্ণনার ভূমিকাস্বরূপ হযরত মরিয়ম সম্পর্কিত কুরআন এবং বাইবেলের নতুন নিয়মে বর্ণিত কিছু ঘটনার এখানে উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। গর্ভধারণের পূর্বে হযরত মরিয়মের জীবন সংস্কারে বাইবেলের নতুন নিয়মে প্রকৃতপক্ষে স্পষ্ট কোন উল্লেখ নেই। মধ্যে এবং লুক কর্তৃক বর্ণিত খন্দের জীবন-কাহিনীতে তাঁর জীবনের উপরোক্ত শুরুত্পূর্ণ ঘটনা সংঘটিত হওয়ার পূর্বের পরিস্থিতি সম্পর্কে খুবই সংক্ষিপ্ত ও অবাক্তর বর্ণনা রয়েছে। মার্ক এবং যোহন এ বিষয়ে সম্পূর্ণ নীরব। মধ্যের মতে যোসেফের (ইউসুফের) সাথে বিয়ে হওয়ার সময় মেরী সন্তান-সন্তাবা ছিলেন। যোসেফ তাকে পরিত্যাগ করতে ইচ্ছা করেছিলেন। কিন্তু এই চরম পত্না অবলম্বনে ফিরিশ্তা স্বপ্নে যোসেফকে এই বলে নিবৃত্ত করেছিলেন, ‘যোসেফ দায়ুদ-সন্তান, তোমার স্ত্রী মরিয়মকে গ্রহণ করিতে ভয় করিও না, কেননা তাঁহার গর্ভে যাহা জন্ম নিয়াছে তাহা পবিত্র আঢ়া হইতে হইয়াছে। (মধ্য-১১৯-২০)।’ যা হোক কুরআন করীম মেরীর পরিবার সংস্কারে আরো বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছে, যে পরিস্থিতি ও পরিবেশে তাঁর জন্ম হয়েছিল, তাঁর মাতার মানত, উপাসনালয়ের কাজে মেরীর জীবন উৎসর্গকরণ এবং সর্বশেষে ঈসা (আঃ)কে তাঁর গর্ভে ধারণ সম্পর্কে (৩৪৩৬,৩৭,৪৮)। বর্তমান সূরা হযরত মরিয়ম সংস্কারে বিশদ বর্ণনা করেছে, যথা: ঈসা (আঃ)কে গর্ভে ধারণ এবং তাঁর জন্মের পর মরিয়ম ও ঈসা (আঃ) এর সঙ্গে কি ঘটেছিল এবং ঈসা (আঃ) এর উপর নবুওয়াতের দায়িত্বতার অর্পণের পর কি ঘটেছিল- তা সবই। এরপে হযরত মরিয়ম সম্পর্কে সকল প্রয়োজনীয় তথ্যসমূহের বিস্তারিত বর্ণনা এবং যেসব শুরুত্পূর্ণ বিষয় নবুওয়াতের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত যা ইসরাইলের বংশ থেকে ইসমাইলের বংশে স্থানান্তরিত হওয়া নিকটবর্তী হয়েছিল, তা-ই বর্তমান সূরার প্রধান বিষয়বস্তু। এখানে এই আয়াতে ‘পূর্বদিকে এক স্থান’ কথাটি বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, সম্ভবত ইহুদীদের সম্মানিত প্রাচীন প্রথার প্রতি নির্দেশ করার জন্য। তারা পূর্ব দিককে পবিত্র মনে করতো। ইহুদী এবং খৃষ্টান জাতি উভয়ে পূর্ব দিককে সম্মান করে থাকে। তারা তাদের উপাসনালয়সমূহ পূর্বমুখী করে নির্মাণ করে।

১৭৪৮। ‘রহ’ এর বিভিন্ন অর্থের জন্য ৭২ টাকা দ্রষ্টব্য।

১৭৪৯। এই উক্তির মর্মার্থ হলো, হযরত মরিয়মের নিকট এক মহান পুত্র জন্ম হওয়ার ঐশী সুসংবাদ বাস্তব বাক্যালাপের মধ্যে প্রকাশিত হয়নি, প্রকাশিত হয়েছিল সত্যস্পন্দন বা কাশ্ফের মাধ্যমে। কাশ্ফ বা দিব্যদর্শনে একজন ফিরিশ্তা স্বাস্থ্যবান পুরুষরূপে মরিয়মের নিকট দর্শন দিয়েছিলেন এবং তাঁকে এক পুত্রের জন্ম সংস্কারে ঐশী সংবাদ দিয়েছিলেন। সুতরাং মরিয়মের দেহাভস্তরে কোন আঢ়া বা রহ প্রবেশ করেনি, বরং কাশ্ফে মানুষের আকৃতিতে কোন ফিরিশ্তা তাঁর নিকট এসে দেখা দিয়েছিলেন।

১৭৫০। যেমন পূর্ববর্তী আয়াত থেকে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে মরিয়ম যা দেখেছিলেন তা কাশ্ফ ছাড়া অন্য কিছু ছিল না এবং সাধারণত একুশ ঘটে থাকে যে কাশ্ফে যখন কেউ কিছু দেখে যদি জাগ্রত অবস্থায় সে তা দেখতে পছন্দ না করে তাহলে কাশ্ফে দেখলেও সে তা পছন্দ করে না। যখন হযরত মরিয়ম ফিরিশ্তাকে মানুষের আকৃতিতে তাঁর স্থানে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলেন তখন তিনি যেহেতু সতী যুবতী ছিলেন সেহেতু স্বত্বাবতই ভীত ও বিব্রত হয়েছিলেন। এই কারণেই এটা খুবই স্বাভাবিক ছিল, তিনি সেই ব্যক্তি থেকে আল্লাহ তাআলার আশ্রয় চেয়েছিলেন।

২০। সে (অর্থাৎ ফিরিশ্তা) বললো, ‘আমি ক্তোমাকে এক পবিত্র পুত্র (সন্তানের সুসংবাদ) দান করার জন্য তোমার প্রভু-প্রতিপালকের এক বাণীবাহক মাত্র।’

২১। সে বললো, ‘কিন্তু আমাকে স্পর্শ করেনি এবং আমি ব্যভিচারিণীও পুরুষই আমাকে স্পর্শ করেনি এবং আমি ব্যভিচারিণীও নহি।’

২২। ‘সে বললো, ‘এভাবেই (হবে)।’ তোমার প্রভু-প্রতিপালক বলছেন, ‘এ কাজ আমার জন্য সহজ। (আর আমরা তাকে সৃষ্টি করবো)★ যেন আমরা তাকে মানুষের জন্য নির্দেশন।’ এবং আমাদের পক্ষ থেকে কৃপার (কারণ) করে দেই। আর এ (হলো) এক স্থিরীকৃত বিষয়।’

দেখুন : ৩৪৪৬ খ. ৩৪৪৮; ১৯৫১ গ. ৩৪৪১, ৪৮; ১৯৪২২; ৫১৪৩।

১৭৫১। ‘বাণী-বাহক’ শব্দ থেকে প্রতিভাত হয় যে ফিরিশ্তা কেবল মাত্র ঐশীবাণী বাহক ছিল এবং মরিয়মকে পুত্র দান করতে আসেনি, বরং এই পুত্রের জন্য সখন্কে সুসংবাদ দিতে এসেছিল। এই কথা কে না জানে যে এক মাত্র আল্লাহই পুত্র দান করতে পারেন, কোন ফিরিশ্তা পারে না। ফিরিশ্তার কাজ শুধু আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা ও হৃকুম বহন করা বা পালন করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

১৭৫২। বর্তমান ও পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে বর্ণিত ঘটনা কাশ্ফে ঘটেছিল। কাশ্ফের মধ্যে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি অবস্থা অনুযায়ী বিভিন্ন প্রকার অনুভূতির অভিজ্ঞতা লাভ করে থাকে। স্বপ্নের মধ্যে তার অনুভূতি এবং কথা কখনো স্বপ্নেরই প্রভাব এবং তার ফলাফল বহন করে, আবার কখনো তা সেরূপ করে না, যেমন সে জাহাত অবস্থায় অনুভব করে। দ্রষ্টান্তস্বরূপ, স্বপ্নে কোন লোক যদি তার পুত্রের মৃত্যুতে খুশী হয়, তার এই অনুভূতি স্বপ্নেরই আরোপিত প্রভাব-বলয় বুঝতে হবে, কারণ কোন সুস্থ প্রকৃতির মানুষ জাহাত অবস্থায় তার পুত্রের মৃত্যুতে আনন্দিত হতে পারে না। অনুরূপভাবে কাশ্ফে ফিরিশ্তাকে দেখে মরিয়ম যে কথাগুলো বলেছিলেন তা স্বপ্নের প্রভাবাধীন হয়েই বলেছিলেন। কেননা তাঁকে যখন শুভ সংবাদ দেয়া হয়েছিল তখন তিনি আনন্দদায়ক বিশ্বায়াবিষ্ট হয়ে তাবলেন, খোদা কি এক পুত্র দান করে কোন অলৌকিক ব্যাপার ঘটাবেন? কিন্তু যদি এই কথাগুলো তাঁর স্বাভাবিক এবং বাস্তব অবস্থার উকি হতো তাহলে পুত্র জন্মের এই সুসংবাদ শুনে তিনি সম্পূর্ণরূপে হত্যুদ্ধি এবং আতঙ্কহস্ত হয়ে পড়তেন এই চিন্তায় যে তাঁর মত এক কুমারীর এক পুত্র জন্ম হবে কি করে! মোট কথা প্রথমোক্ত অবস্থায় অর্থাৎ কাশ্ফের অবস্থায় আল্লাহ তাআলা হযরত মরিয়মকে পুত্রস্তান দানপূর্বক যে মহান অনুগ্রহে তৃষ্ণিত করতে যাচ্ছেন তাতে তাঁর আনন্দদায়ক বিশ্বয় প্রকাশ পায়। কিন্তু শেষোক্ত অবস্থায় তাঁর উকি মনের আতঙ্কজনক পরিস্থিতিতে নিজেকে নিঃসঙ্গবোধ করার ভাব প্রকাশ করে।

কিন্তু পক্ষান্তরে ‘কোন পুরুষ আমাকে স্পর্শ করেনি’ কথাটি দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে হযরত মরিয়ম বুঝেছিলেন, উকি সংবাদটির মর্ম ছিল, বিয়ে ছাড়াই তিনি এক সন্তান লাভ করবেন, কারণ বৈবাহিক সূত্রে কোন পুরুষ মানুষকে না জানার কথা বলার মধ্যে কোন যৌক্তিকতা নেই এবং ‘আমি অসতীও নই’ এই কথাগুলো বৈধ দার্পণ্য বহিভূত কোন মানুষকে জানার অঙ্গীকার বুঝাচ্ছে। ফিরিশ্তার কথায় তাঁর প্রতিউভাবে দেখা যায়, মরিয়মের মনে ভাবান্তর দেখা দিয়েছিল। পূর্বাহোই চির কৌমার্যের শপথ তার সন্তান হওয়ার পথে প্রতিবন্ধক হয়ে রয়েছে। কুরআনের কোন কোন তফসীরকারকের ধারণা অনুযায়ী পূর্ববর্তী আয়াতের ভবিষ্যদ্বাণীতে এক পুত্রের জন্ম কোন এক ভবিষ্যৎ সময়ে তাঁর দার্পণ্য সম্পর্কে ফলস্বরূপ হবে বলে তিনি ভেবেছিলেন। যদি তাই হয় তাহলে মরিয়মের পক্ষে সেই সময়ে বিশ্বয় প্রকাশ করার কোন কারণ ছিল না।

\* [আল্লামা কুরতুবী (রহঃ) এর মতে বক্ফনীভুক্ত শব্দগুলো আয়াতটির অর্থে নিহিত রয়েছে। (হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে’ (রাহেঃ) কর্তৃক উর্দ্ধতে অনুন্দিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টাকা দ্রষ্টব্য)]

১৭৫৩। এই আয়াতে ইসাই (আঃ) এর বিনা পিতায় জন্ম হওয়ার ভবিষ্যদ্বাণী নিহিত রয়েছে যা ইসরাইলীদের জন্য অবশ্যই এক বিরাট নির্দেশন ছিল। এতে ইংগিত ছিল যে ইসরাইলী বংশ থেকে ইসমাইলী বংশে নবুওয়ত স্থানান্তরিত হওয়া আসম এবং ইহুদীদের জন্য এই সতর্ক সংকেত করেছিল, তারা আত্মিকভাবে এতই কল্যাণিত এবং নৈতিকভাবে এতই অধিঃপতিত হয়েছিল যে তাদের কোন পুরুষ আল্লাহ তাআলার নবীর পিতা হওয়ার মত যোগ্য ছিল না। এই অর্থেই কুরআনে হযরত ইসাই (আঃ)কে ‘নির্ধারিত সময়ের একটা নির্দেশন’ বলা হয়েছে (৪৩৬২) অর্থাৎ সেই সময়ের নির্দেশন যখন নবুওয়ত ইসরাইলী বংশ থেকে ইসমাইলী বংশে স্থানান্তরিত হয়ে যাবে।

قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولٌ رَّيْلَكٌ لَّا يَحْبَبُ  
لَكُوكْلَمَّا زَكِيًّا

قَالَ أَنْتَ أَنْتَ يَكُونُ لِي عِلْمٌ وَلَكَ مِسْتَشْفَنِي  
بَشَرٌ وَلَكَ بَغْيَي়া

قَالَ كَذَلِكَ جَقَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَمِينْ  
وَلَنْجَعَلَهُ أَيَّةً لِلَّنَاسِ وَرَحْمَةً مَنَاجَهَ  
كَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا

২৩। অতএব সে তাকে (গর্ভে) ধারণ করলো<sup>১৭৫৪</sup> এবং তাকে নিয়ে এক দূরবর্তী স্থানে সরে গেল<sup>১৭৫৫</sup>।

فَحَمَلَتْهُ فَأَنْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا  
قصيّاً<sup>১৭৫৫</sup>

১৭৫৪। 'আর এ (হলো) এক স্থিরীকৃত বিষয়' উভির মর্ম এই যে পিতা ছাড়াই হয়রত মরিয়মের এক পুত্র জন্ম গ্রহণ করবে এবং এই শ্রী সিদ্ধান্ত অপরিবর্তনীয়। আল্লাহ্ তাআলার অপরিবর্তনীয় সিদ্ধান্ত প্রকাশার্থে কুরআন করীমে তাকদির ও কায়া এই দুটি শব্দের ব্যবহার হয়েছে। প্রথমোক্ত শব্দে পরিকল্পনা বা নির্ধারণ এবং শেষোক্ত শব্দ ফয়সালা বা ডিক্রীদান করা বোবায়। যখন কোন পরিকল্পনা বা স্থীর কার্যকর করার জন্য গ্রহণ করা হয় তখন তাকে 'কদর' বলা হয় এবং যখন তার সম্বন্ধে আল্লাহ্ তাআলার ফয়সালা চূড়ান্ত হয়ে যায় যে তা কার্যে পরিণত করা হোক তখন তাকে 'কায়া' বলা হয়। ঈসা (আঃ) এর জন্ম পিতা ছাড়া হওয়া ছিল আল্লাহর একটি কায়া।

১৭৫৫। স্বামী সংসর্গ ছাড়াই হয়রত মরিয়ম কীরুপে গর্ভধারণ করেছিলেন তা আল্লাহ্ তাআলার সেই সকল গোপন রহস্যের অন্যতম যা এখন পর্যন্ত মানব-বুদ্ধির অগম্য। বিষয়টি এখনো পর্যন্ত প্রাকৃতিক বিধান সম্বন্ধে আমরা যতদূর জানতে পেরেছি তার অনেক উর্ধ্বে। কিন্তু মানুষের সর্বোচ্চ জ্ঞানও অত্যন্ত সীমিত। মানুষ সকল প্রকার শ্রী শুশ্রেষ্ঠ তথ্য উপলব্ধি করতে সক্ষম হয় না। প্রকৃতির মধ্যে এমন রহস্য বিদ্যমান রয়েছে যা মানুষ এখনো উদ্ঘাটন করতে সক্ষম হয়নি, সম্ভবত সে কখনো সক্ষম হবে না। সে সবের মধ্যে পিতা ছাড়া ঈসা (আঃ) এর জন্মের বিষয়টি ধরে নেয়া যায়। আল্লাহ্ তাআলার পদ্ধতি দুর্জেয় ও দুর্বোধ্য এবং তাঁর শক্তি অসীম। কেবল 'কুন' (হও) শব্দ উচ্চারণে যে খোদা এই বিশ্ব সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন, নিচয়ই তিনি জড় পদার্থে একটি পরিবর্তন আনয়ন করতে পারেন যা বাহ্যদৃষ্টিতে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ দ্বারা সমাধান করা অসম্ভব। অধিকন্তু চিকিৎসা বিজ্ঞান, জীববিজ্ঞানের দৃষ্টি থেকে প্রকৃতির বিশেষ অবস্থাধীনে যৌন সংসর্গ ছাড়া সন্তান জন্ম বা পুরুষের স্পর্শ ছাড়া নারীর সন্তান উৎপাদনের সম্ভাবনাকে (parthenogenesis) নাকচ করা যায় না। চিকিৎসাবিদগণ নারীর শ্রোণিতে বা নিম্নাগ্রের ভিতর সময় সময়ে প্রাণ 'আরেনো ব্লাস্টোমা' (Arrhenoblastoma) নামীয় এক বিশেষ প্রকার টিউমারের কারণে এই সম্ভাবনার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এই সব টিউমার পুরুষ শুক্রাণু বা পুঁ-জননকোষ উৎপাদন করতে সক্ষম। যদি এই 'আরেনো ব্লাস্টোমা' দ্বারা কোন নারীদেহে স্বক্রিয় বা জীবিত পুঁ-জননকোষ সৃষ্টি হয় তাহলে সেই নারী কুমারী হলেও তার গর্ভধারণ করার সম্ভাবনা অস্বীকার করা যায় না, অর্থাৎ তার নিজ দেহে একটি ক্রিয়াশীল হবে যেন কোন পুরুষের দেহ থেকে শুক্রাণু সাধারণ প্রক্রিয়া দ্বারা অথবা কোন চিকিৎসা বিজ্ঞানীর সাহায্যে তার দেহে স্থানান্তরিত হয়ে গেছে। সাম্প্রতিককালে ইউরোপের এক দল স্বীরোগ বিশারদ সন্তান প্রসবের দৃষ্টান্ত প্রমাণ করতে এমন সব ঘটনা প্রকাশ করেছেন যেখানে প্রসূতি মাতার কোন সম্পর্ক বা সংযোগ কোন পুরুষের সঙ্গেই ছিল না (Lancet)। ঈসা (আঃ) এর জন্ম পিতার সংযোগ ছাড়া হওয়ার ব্যাপারটা বোধ হয় সম্পূর্ণভাবে একমাত্র ও অদ্বিতীয় ঘটনা নয়। পিতা ছাড়া শিশুর জন্মের বহু ঘটনার প্রমাণ রয়েছে (এনসাইক ব্রিট এর 'ভারজিন বার্থ' অধ্যায় এবং 'এ্যানোমোলিস এন্ড কিউরিওসিটিস অব মেডিসিন, ডিলিউ বি সাউন্ডারস কোং, লন্ডন কর্তৃক প্রকাশিত)। যদি আমরা এই সমস্ত সম্ভাবনাকে বাদ দেই এবং অগ্রহ্য করি তাহলে হয়রত ঈসা (আঃ) এর জন্ম, নাউয়াবিল্লাহ্ অবৈধ বিবেচিত হবে। খৃষ্টান এবং ইহুদী উভয়ে এক মত যে ঈসা (আঃ) এর জন্ম সাধারণ অবস্থার ব্যতিক্রম – খৃষ্টানদের মতে এটা অলৌকিক বা অতিপ্রাকৃত এবং ইহুদীদের মতে অবৈধ ছিল (যিউ এনসাইক)। এমন কি পারিবারিক কৃষ্ণ-নামাতেও ঈসা (আঃ) এর জন্ম এইরূপেই লিপিপদ্ম রয়েছে (তালমুদ)। কেবল মাত্র এই বাস্তব ঘটনাটাই গ্রহণযোগ্য প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত করে যে ঈসা (আঃ) এর জন্ম অসাধারণ ছিল। বাইবেলের নৃতন নিয়মানুযায়ী মরিয়মের স্বামী যোসেফ ঈসা (আঃ) এর জন্ম না হওয়া পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে দাস্ত্য সম্পর্ক স্থাপন করেনি (মথি-১৪:২৫)। অতএব 'সে তাকে (গর্ভে) ধারণ করলো' বাক্যাংশ কোন পুরুষের সংসর্গ ছাড়া হয়রত মরিয়মের অসাধারণভাবে গর্ভবতী হওয়ার প্রতি ইংগিত করছে।

১৭৫৬। 'এক দূরবর্তী স্থান' বুবাতে নায়ারেখ থেকে প্রায় সন্তুর মাইল দক্ষিণে বৈথলেহেমের প্রতি ইশারা করছে। ঈসা (আঃ) এর জন্মের কিছুকাল পূর্বে যোসেফ মরিয়মকে বৈথলেহেম শহরে নিয়ে গিয়েছিলেন যেখানে হয়রত ঈসা (আঃ) ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন।

★ ২৪। এরপর তার প্রসব বেদনা তাকে এক খেজুর গাছের<sup>১৭৫৭</sup> কান্ডের দিকে যেতে বাধ্য করলো। সে বললো, ‘হায়! এর পূর্বেই যদি আমি মরে যেতাম এবং সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে যেতাম’।

২৫। তখন সে (অর্থাৎ ফিরিশ্তা) তাকে তার (অবস্থানস্থলের) নিচের দিক<sup>১৭৫৮</sup> থেকে ডেকে (বললো), ‘তুমি দুশ্চিন্তা করো না। তোমার প্রভু-প্রতিপালক তোমার পাদদেশ দিয়ে এক বর্ণ প্রবাহিত করেছেন।

২৬। আর খেজুর গাছের ডাল ধরে তুমি নিজের দিকে ঝাঁকুনি দাও। সেটা তোমার জন্য তাজা পাকা খেজুর ঝরাবে<sup>১৭৫৯</sup>।

فَاجْأَاهُهَا الْمَعَاصِرُ إِنِّي جَذَعُ النَّخْلَةِ جَـ  
قَالَتْ يَلَيْتَنِي مِثْ قَبْلَ هَذَا وَ كُنْتَ  
نَشِيًّا مَّنْسِيًّا<sup>⑭</sup>

فَنَادَاهَا مَنْ تَحْتَهَا أَلْهَ تَحْزِينٍ قَدْ  
جَعَلَ رَبُّكَ تَحْتَلِتْ سَرِيًّا<sup>⑮</sup>

وَهُزِيَّ إِلَيْكَ بِجَذَعِ النَّخْلَةِ تُسْقَطُ  
عَلَيْكَ رُطْبًا جَنِيًّا<sup>⑯</sup>

১৭৫৭। বাইবেলের নৃতন নিয়মে দেখা যায়, বৈথলেহেম যে সরাইখানায় ঈসা (আঃ) ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন সেখানে কোন প্রকোষ্ঠ ছিল না। যোসেফ এবং মরিয়ম বাধ্য হয়েই খোলা মাঠে অবস্থান করেছিলেন এবং মরিয়ম বিশ্বামের উদ্দেশ্য খেজুর গাছের কান্ডের নিকটে ছায়ার নিচে গেলেন, সম্বত প্রসব বেদনায় কিছু অবলম্বন গ্রহণের জন্যেও।

১৭৫৮। ‘তাহ্ত’ শব্দের অর্থ পাহাড়ের ঢালু স্থান এবং উত্তরাই ও ঝুঁকায় (লেইন)। এই আয়াতের মর্ম হলো যে পাহাড়ের ঢালু দিক থেকে মরিয়মের নিকট আওয়াজ এসেছিল। প্রকৃতপক্ষে বৈথলেহেম শহর সমুদ্রতল থেকে ২৩৫০ ফুট উচ্চে পর্বতের উপর অবস্থিত এবং খুবই উর্বর উপত্যকা দ্বারা পরিবেষ্টিত। এই পাহাড়ে বহু বর্ণ আছে। এগুলোর মধ্যে একটি ‘সুলায়মানের ঝর্ণা’ নামে পরিচিত। অন্য একটি ঝর্ণা শহরের দক্ষিণ পূর্বদিকে ৮০০ গজ দূরে অবস্থিত। এই সকল ঝর্ণা থেকে বৈথলেহেম শহরে পানি সরবরাহ হয়ে থাকে।

১৭৫৯। এই আয়াত অনুযায়ী হ্যরত ঈসা (আঃ) এর জন্ম এমন এক সময়ে হয়েছিল যখন জুদাইয়াতে গাছে গাছে ছিল তাজা পাকা খেজুর। এতে স্পষ্টতই প্রমাণ হয়, সময়টা আগষ্ট-সেপ্টেম্বর মাস যা সেখানকার খেজুরের মৌসুম। কিন্তু খৃষ্টানদের প্রচলিত ধারণা মতে ঈসা (আঃ) এর জন্ম ২৫শে ডিসেম্বর। এই দিনটি খৃষ্টান জগতের সর্বত্র মহাসমারোহে প্রতি বৎসর ‘বড় দিন’ হিসাবে পালিত হয়ে থাকে। খৃষ্টানদের এই বিশ্বাসকে কেবল কুরআন একাই ভুল প্রতিপন্ন করেনি, বরং ইতিহাস এমনকি বাইবেলের নৃতন নিয়মও এই দিনটি সম্বন্ধে এক মত নয়। ঈসা (আঃ) এর জন্মের সময় সম্বন্ধে লুক লিখেছেন, ‘ঐ অঞ্চলে মেষপালকেরা মাঠে অবস্থান করিতেছিল এবং রাত্রিকালে আপন আপন পাল চৌকি দিতেছিল’ (লুক-২৪:৭-৮)। লুকের এই বক্তব্যের সমালোচনায় বিশপ বার্মস তাঁর রচিত প্রসিদ্ধ গ্রন্থ ‘দি রাইজ অব ক্রিস্টিয়ানিটি’ এর ৭৯ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, “তদুপরি যীশুর প্রকৃত এবং সঠিক জন্ম তারিখ যে ২৫শে ডিসেম্বর ছিল এই বিশ্বাসের কোন নির্ভরযোগ্য প্রমাণিত দললীল নাই। বৈথলেহেমের নিকট খোলা মাঠে মেষপালক রাখালদের রাত্রিকালে পহারারত অবস্থা সম্বন্ধে লুকের বর্ণিত জন্ম-কাহিনী যদি আমরা বিশ্বাস করি তাহলে যীশুর জন্ম শীতের মঙ্গসুমে হয় না, যখন জুদাইয়ার পাহাড়ী এলাকায় রাত্রের তাপমাত্রা এত নীচে নামিয়া যায় যে তুষারপাতাই স্বাভাবিক। অনেক সুভি-তর্কের পরে মনে হয় আমাদের বড়দিন অর্থাৎ ক্রিসমাস বা খৃষ্টের জন্মদিন নির্ণীত হইয়াছে ৩০০ খৃষ্টাব্দে”। বিশপ বার্মসের এই অভিমত এন্সাইক্লোপেডিয়া বৃটানিকা এবং চৰ্মাৰ্স এনসাইক্লোপেডিয়া ‘ক্রিসমাস’ অধ্যায় কর্তৃক সমর্থিতঃ “খৃষ্টের জন্মের সঠিক দিন তারিখ কখনই সন্তোষজনকভাবে স্থিরীকৃত হয় নাই। কিন্তু গীর্জার পুরোহিতগণ ৩৪০ খৃষ্টাব্দ যখন এই ঘটনার স্মৃতি-তর্পণ উদ্যাপনের দিন স্থির করিল তখন তাহারা অতি বিজ্ঞানোচিতভাবে মকরজ্ঞানিতে সূর্যের অবস্থানের দিবসকে নির্ধারণ করিয়াছিল, যে দিনটি তাহাদের অত্যন্ত শুরুত্বপূর্ণ আনন্দোৎসবের দিন হিসাবে জনাসাধারণের মনে পূর্বাঙ্গেই গভীরভাবে রেখাপাত করিয়াছিল। মানব প্রণীত পঞ্জিকায় পরিবর্তনের কারণে নিরক্ষ রেখা হইতে সূর্যের দূরত্ব স্থানে অবস্থানকাল এবং ক্রিসমাস দিবসের মধ্যে পার্থক্য মাত্র অল্প কয়েক দিনের” (এনসাইক ব্রিট, ১৫শ সংস্করণ, ৫ম খন্দ-৬৪২ এবং ৬৪২-ক পৃষ্ঠা)। ... “দ্বিতীয়ত, মকরজ্ঞানি সূর্যের জন্ম দিবস হিসাবে পরিগণিত হইয়াছিল এবং রোমে ২৫ শে ডিসেম্বরে সূর্য-দেবের জন্মতিথি উপলক্ষে পৌরনীলিক উৎসব পালিত হইত। খৃষ্টান যাজক সম্প্রদায় এই জনপ্রিয় প্রচলিত আনন্দ-উৎসবকে বন্ধ করিতে ব্যর্থ হইয়া ইহাকে আধ্যাত্মিকভাবে নামে ন্যায়পরায়ণ সূর্য-দেবের উৎসব হিসাবে পালন করিতে শুরু করিল” (চার্চ, এনসাইক)। এনসাইক্লোপেডিয়ার এই বর্ণনাসমূহ পিক (Peake) প্রণীত ‘কমেন্টারী অব দি বাইবেল’ দ্বারা সমর্থিত হয়েছে। এই গ্রন্থের ৭২৭ পৃষ্ঠায় পিক বলেনঃ “(যীশুর জন্মের) মৌসুম ডিসেম্বর নহে, আমাদের বড় দিন (Christmas day) তুলনামূলকভাবে পাচাত্ত্বে পরবর্তীতে প্রচলিত ঐতিহ্যে।” সাম্প্রতিককালে খৃষ্টান ধর্মতের উৎপত্তি সম্বন্ধে ঐতিহাসিক গবেষণা সন্দেহাতীতরূপে প্রমাণ করেছে, ঈসা (আঃ) ডিসেম্বর মাসে জন্ম গ্রহণ করেননি। ডঃ জন ডি, ডেভিস (Dr. John D. Davis) তাঁর রচিত ডিক্ষনারী অব দি বাইবেল (Dictionary of the Bible) পৃষ্ঠকে ‘বৎসর’ (Year) শব্দের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, ইহুদীদের ইলুল (Elul) মাসে খেজুর পাকে এবং ‘পীকের কমেন্টারী অন দি বাইবেল’ এর ১৭৭ পৃষ্ঠায় আমরা চীকার অবশিষ্টাংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

২৭। অতএব তুমি খাও, পান কর এবং চোখ জুড়াও। আর তুমি কোন মানুষ দেখলে বলো, ‘নিশ্চয় আমি রহমান (আল্লাহর) উদ্দেশ্যে রোয়া মানত করেছি। সুতরাং আজ আমি কোন মানুষের সাথে কোন কথা বলবো না।<sup>১৬০</sup>

২৮। এরপর সে তাকে (অর্থাৎ ঈসাকে বাহনে) উঠিয়ে<sup>১৬১</sup> তার জাতির কাছে নিয়ে এল। তারা বললো, ‘হে মরিয়ম! তুমি নিশ্চয় অত্যন্ত মন্দ কাজ করেছ।<sup>১৬২</sup>

দেখতে পাই, ইলুল মাস আগষ্ট-সেপ্টেম্বর মাসেই পড়ে। ডঃ জীক আরো বলেন, ‘জে স্ট্যার্ট তাদের প্রণীত ‘হোয়েন ডিড আওয়ার লর্ড আকচুয়ালী লিভ’ (When did our lord actually live?) পুস্তকে, এংগোরা মন্দিরে বক্ষিত শীলালিপি এবং প্রাচীন চীনের সাহিত্য থেকে উদ্ভৃতি দিয়ে খণ্টের জীবন কাহিনী সুদূর চীনে ২৫-২৮ খ্রঃ অঃ সময়ে প্রাচীন বাণীর দ্বারা যুক্তির মাধ্যমে বীকুর জন্ম খণ্টপূর্ব ৮ সনে (সেপ্টেম্বর বা অক্টোবর) বলে নির্ধারণ করেছেন এবং ২৪ খণ্টাব্দের বুধ বারে ক্রশবিদ্ধ হওয়ার কথা সাব্যস্ত করেছেন।’ দুটি এনসাইক্লোপেডিয়ার উপরোক্ত বর্ণনা ‘কমেন্টারী অব দি বাইবেল’ এর উদ্ভৃতি দ্বারা সমর্থিত হওয়া এই ঘটনায় সুস্পষ্ট হয়ে উঠে যে ঈসা (আঃ) ইহুদীদের ইলুল মাসে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। ইলুল ইংরাজী মাস আগষ্ট-সেপ্টেম্বরের সময়কালে পড়ে, যে সময় জুদাইয়াতে খেজুর পাকার মওসুম এবং তা ২৫ ডিসেম্বরের নয় যেভাবে খৃষ্টান গীর্জগুলো আমাদেরকে বিশ্বাস করাতে চায়। পবিত্র কুরআনও এই মতই ব্যক্ত করে। প্রকৃত ঘটনাটি হবে, ঈসা (আঃ) এর জন্ম তারিখ নির্ধারণের সমস্ত গোলমাল সৃষ্টির কারণ মনে হয় হ্যরত মরিয়মের গর্ভধারণের তারিখ সম্পর্কে বিভ্রান্তি। নভেম্বর অথবা ডিসেম্বর মাসে মরিয়ম গর্ভধারণ করেছিলেন বলে মনে হয়, চার্চের ইতিহাসবিদদের বিশ্বাস মতে মার্চ বা এপ্রিল মাসে নয়। চার-পাঁচ মাস গর্ভধারণের পর গর্ভাবস্থাকে দৃষ্টি থেকে আড়ালে রাখা যখন আর সম্ভব ছিল না তখন মরিয়মকে নিয়ে পরের বৎসর মার্চ অথবা এপ্রিল মাসে যোসেফের বাড়ীতে চলে যাওয়ার জন্য যোসেফকে বুঝিয়ে রাজি করানো হলো। এভাবেই খৃষ্টান ঐতিহাসিকরা মার্চ বা এপ্রিল মাসকে— যখন মরিয়মকে যোসেফের বাড়ীতে নেয়া হয়েছিল—তাঁর গর্ভধারণের মাস বলে ভুল করেছিল যা কীনা চার-পাঁচ মাস পূর্বেই ঘটেছিল।

তফসীরাধীন আয়াত থেকে দেখা যায়, মরিয়ম পর্বতের উপরিভাগে কোন ছাঁটনি বা আবরণের মধ্যে আশ্রয় নিয়েছিলেন এবং পাহাড়ের ঢালুতে খেজুর বৃক্ষ ছিল এবং এই জন্যই মরিয়ম সহজেই বৃক্ষের নিকট পৌঁছে তাতে নাড়া দিতে পেরেছিলেন। বৈথলেহেম অঞ্চল যে খেজুর বৃক্ষ দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল তা বাইবেল থেকেও সুস্পষ্ট (বিচারক-১৪১৬) এবং ডঃ জন ডি, ডেভিস, ডি, ডি প্রণীত ‘এ ডিকশনারী অব দি বাইবেল’ থেকেও স্পষ্ট। এ ঢাড়া পূর্ববর্তী আয়াতে যেমন উল্লেখ করা হয়েছে যে মরিয়ম নিকবর্তী বর্ণাটিতে গিয়ে পানি পান করতে এবং নিজেকে ধোত করতে নির্দেশিত হয়েছিলেন। এই ঘটনাই অঙ্গুলী নির্দেশ করছে, হ্যরত ঈসা (আঃ) আগষ্ট-সেপ্টেম্বরে ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন। কারণ জুদাইয়ার বরফ জয়নো আবহাওয়াতে মরিয়মের পক্ষে খোলা বাতাসে গোসল করা বা নিজেকে ধোত করা সম্ভব ছিল না (দি লারজার এডিশন অব দি কমেন্টারী, ১৫৭৩-১৫৭৬ পৃঃ দ্রষ্টব্য)।

১৭৬০। অথবা কথা বলা থেকে বিরত ধাকার আদেশের অর্থ ছিল এক দিকে তাঁর দৈহিক শক্তি অক্ষুণ্ণ রাখা, অপর দিকে বেশী সময় আল্লাহ তাআলার স্মরণে নিজেকে একান্তভাবে নিয়োজিত রাখার সুযোগ দেয়া।

১৭৬১। ‘তাহমিলুহ’ এই অর্থের জন্য দেখুন ১৯৯২। বাইবেলের নৃতন নিয়মে দেখা যায়, বৈথলেহেমে ঈসা (আঃ) এর জন্মের পর ঐশী নির্দেশে যোসেফ তাঁকে এবং মরিয়মকে নিয়ে মিশরে গেলেন এবং সেখানে তাঁরা কয়েক বৎসর কাটালেন এবং বাদশা হিরোদের মৃত্যুর পর তাঁরা নেয়ারথে ফিরে গেলেন এবং সেখাসেই বসবাস করতে থাকলেন (মথি-২৪১৩-২৩)। এই ব্যাপারে বাইবেলে উল্লেখিত এক ভবিষ্যদ্বাণীও ছিল যে ঈসা (আঃ) এক গাধায় চড়ে তাঁর মায়ের সঙ্গে স্বজাতির নিকট আসবেন (মথি-২১৪৪-৭)। ঈসা (আঃ) এবং মরিয়ম বাস্তবেই গাধার উপর যেরুজালেমে প্রবেশ করেছিলেন। ‘তাহমিলুহ’ উক্তি সংজ্ঞাত বাইবেলের সেই ভবিষ্যদ্বাণীর প্রতিই ইংগিত করে। তফসীরাধীন আয়াতে সেই সময়কেই নির্দেশ করে যখন ঈসা (আঃ) প্রত্যাদিষ্ট হয়েছিলেন এবং নববুওয়ত প্রাণ হয়েছিলেন, যেমন ৩১-৩৪ আয়াত থেকে তা সুস্পষ্ট।

১৭৬২। ‘ফারিয়া’ শব্দের অর্থ মিথ্যা জালকারীও হয়ে থাকে (লেইন)। এই শব্দ ব্যবহার দ্বারা ইহুদী প্রধানরা কটাক্ষ ও বক্রেক্ষি করেছিল যেন মরিয়ম ছিলেন অসতী নারী এবং ঈসা (আঃ) মিথ্যা জালিয়াত ও ভস্ত-নবী।

فَكُلْنِ وَ اشْرِبْنِ وَ قَرِئْنِ عَيْنَنِ جَفَانَا  
تَرِيئَنِ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، فَقُولَنِ إِنِّي  
نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْنَانِ فَلَنْ أُكَلِّمَ  
الْيَوْمَ إِنْسِيَّا<sup>১৬৩</sup>  
فَأَتَثْ بِهِ قَوْمَهَا تَخْوِلْهُ دَقَالُوا  
يَمْرِيْمُ لَقَذْ جَثْ شَيْنَافِرِيَّا<sup>১৬৪</sup>

২৯। হে হারুনের বোন<sup>۱۷۳</sup>! তোমার পিতা তো খারাপ লোক ছিল না এবং তোমার মাও ব্যভিচারিণী ছিল না'।

يَا حَتَّىٰ هُرُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ  
وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَخِيًّا<sup>۱۷۴</sup>

৩০। তখন সে তার (অর্থাৎ ঈসার) দিকে ইঙ্গিত করলো<sup>۱۷۵</sup>।  
তারা বললো, ‘দোলনার এক শিশুর সাথে আমরা কিরণে কথা  
বলবো’<sup>۱۷۶</sup>?

فَأَشَارَتِ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُحَلِّمُ مَن  
كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا<sup>۱۷۷</sup>

৩১। সে (অর্থাৎ ঈসা) বললো, ‘নিশ্চয় আমি আল্লাহর এক  
বান্দা। তিনি আমাকে কিতাব দান করেছেন এবং আমাকে  
নবী বানিয়েছেন।

قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ شَئْلِيَ الْكِتَبِ وَ  
جَعَلَنِي نَبِيًّا<sup>۱۷۸</sup>

১৭৬৩। কুরআন করীমে মরিয়মকে হ্যরত হারুন (আঃ) এর ভন্নীরপে আখ্যায়িত করায় রসূল করীম (সাঃ) এর নিকট প্রশ্ন করা হয়েছিল। জবাবে ভ্যুর পাক (সাঃ) প্রশ্নকারীকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, ইসরাইলীরা তাদের সন্তানদের নাম নবী এবং সাধু বৃদ্ধিগণের নামের অনুকরণে রাখতো, তা তিনি জানেন কিনা (বয়ান, ৬ষ্ঠ খন্দ, পৃঃ ১৬, ও জারীর, ১৬শ খন্দ, পৃঃ ৫২)। এখানে মরিয়মকে হারুন এর ভন্নী বলা হয়েছে, মূসা (আঃ) এর ভন্নী বলা হয়নি, যদিও উভয়ই ছিলেন তাই। কার্যত হ্যরত মূসা (আঃ) ছিলেন ইহুদী ধর্মের প্রবর্তক এবং হারুন (আঃ) ছিলেন ইহুদী যাজক শ্রেণীর প্রধান (এনসাইক বিব এন্ড এনসাইক ট্রিট, ‘আরোন’ অধ্যায়) এবং হ্যরত মরিয়মও পুরোহিত সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। মহানবী (সাঃ) এর পবিত্র জীবনের এক ঘটনা তাবারী বর্ণনা করেছেন যা পাঠকবৃন্দকে তাৰ, ‘আম, উথ্রত এইরূপ আৱৰ্বী শব্দের মৰ্ম উপলক্ষি কৰার অন্তর্দৃষ্টি দান কৰে। নবী করীম (সাঃ) এর স্ত্রী ইহুদী-বংশজাত হ্যরত সাফিয়া (রাঃ) একদিন আঁহয়ৰত (সাঃ) এর নিকট অভিযোগ কৰলেন যে তাঁর কোন কোন স্ত্রী তাঁকে ইহুদী নারী বলে কটাক্ষ কৰে। এতে নবী করীম (সাঃ) তাঁকে বিদ্যুপের প্রতিউত্তর এই কথা বলে দিতে বলেছিলেন যে হারুন (আঃ) তাঁর পিতা, মূসা (আঃ) তাঁর চাচা এবং হ্যরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর স্বামী। এখন ঘটনা তো এই যে নবী করীম (সাঃ) নিশ্চয়ই জানতেন, না হারুন (আঃ) ছিলেন হ্যরত সাফিয়া (রাঃ) এর পিতা, না হ্যরত মূসা (আঃ) তাঁর চাচা। কুরআন শরীফের ৩৩:৭০ আয়াতে এই অভিযোগের উল্লেখ রয়েছে। ইহুদীদের বয়োজ্যষ্ঠ লোকেরা ঈসা (আঃ) এর মাকে ‘হারুন (আঃ) এর বোন’ বলে হ্যরত এ বুঝাতে চেয়েছিলেন যে হারুনের বোন মেরী যেমন হ্যরত মূসা (আঃ) এর বিজনে এক নারীকে অবৈধতাবে বিয়ে কৰার অভিযোগ এনে এক জঘন্য অপরাধ করেছিল (এই অভিযোগ সম্পর্কে ৩৩:৭০ আয়াতে উল্লেখিত), তেমনি তিনিও তাঁর একই নামধারীর মত অবৈধ সন্তান জন্ম দিয়ে এক জঘন্য পাপ করেছেন। আরো বিস্তারিত জানার জন্য ৪০১ টীকা দ্রষ্টব্য।

১৭৬৪। ‘তখন সে তার (অর্থাৎ ঈসা) দিকে ইঙ্গিত করলো’ এই উক্তির মৰ্ম হলো, হ্যরত মরিয়ম জানতেন, যদি ইহুদীদের বয়োজ্যষ্ঠরা তাঁর নিকট প্রশ্ন রাখে তবে ঈসা (আঃ) কি উত্তর দিবেন। এই কথাগুলোর অর্থ এও হতে পারে যে মরিয়ম জানতেন, তিনি যদি নিজেকে নির্দোষ ঘোষণা কৰেন তবে কেউ তাঁকে বিশ্বাস কৰবে না। তাঁর নির্দোষিতার একমাত্র প্রমাণ তাঁর পুত্র। মরিয়ম বুঝাতে চেয়েছিলেন যে এমন পবিত্র ও সাধু সন্তান, যাকে আল্লাহ তাআলার একপ মহৎ গুণাবলীর দ্বারা ভূষিত করেছেন সে কখনো অসৎ বা অবৈধ সংযোগের ফল হতে পারে না এবং তাঁর ধর্মপ্রায়ণতা ও সদ্গুণসমূহ স্বতঃস্ফূর্তভাবে মরিয়মের নির্দোষ হওয়ার পক্ষে যথেষ্ট সত্যতা প্রতিপাদন কৰে। সেই জন্যই তিনি ঈসা (আঃ)কে দেখিয়ে দিয়েছিলেন।

১৭৬৫। এই আয়াত বুঝতে কোন অসুবিধা হয় না। ইহুদী প্রধানদের বিদ্যুপ শনে মরিয়ম তাদের মনোযোগ ঈসা (আঃ) এর দিকে নিবন্ধ কৰতে চেয়েছেন। তারা ঈসা (আঃ) এর সঙ্গে কথা বলতে স্থুৎ বোধ কৰলেও তাঙ্গিল্যপূর্ণভাবে বলে উঠলো, যে কিনা ‘দোলনার এক শিশু’ অর্থাৎ যে বালক তাদের চেয়ের সম্মুখে জন্ম ও প্রতিপালিত হয়েছে তার সঙ্গে কি কথা বলবোঁ বয়সে অনেক ছোট কারো নিকট থেকে জ্ঞান অর্জনের জন্য আমন্ত্রিত হওয়ার মধ্যে বয়োবৃন্দ ব্যক্তিরা অভ্যন্ত নয়। কথাগুলো দ্বারা ঈসা (আঃ) এর প্রতি স্বীকার্যাঙ্গক অবজ্ঞাপূর্ণ ভাব প্রকাশের অবস্থাকে উপস্থাপন কৰা হয়েছে। আরো দেখুন ৩:৪৭ আয়াত।

৩২। আর আমি যেখানেই থাকি না কেন তিনি আমাকে কল্যাণমণ্ডিত করেছেন। আর আমি যতদিন জীবিত থাকি তিনি আমাকে নামায ও যাকাত (আদায় করার) তাগিদ দিয়েছেন।

৩৩। আর <sup>৷</sup>তিনি আমাকে আমার মায়ের প্রতি সদাচারী (বানিয়েছেন) এবং তিনি আমাকে উগ্র ও কঠোর বানাননি<sup>১৬৩</sup>।

৩৪। আর আমার ওপর শান্তি (বর্ষিত হয়েছিল) <sup>৷</sup>যেদিন আমি জন্মেছিলাম। যেদিন আমি মারা যাব এবং যেদিন আমাকে জীবিত করে উত্থিত করা হবে (সেদিনও আমার ওপর শান্তি বর্ষিত হবে)।'

৩৫। এ হলো মরিয়মের পুত্র ইসা<sup>১৬৪</sup>। (এটাই) সেই সত্য বিবরণ, যার সম্পর্কে তারা সন্দেহ করছে<sup>১৬৫</sup>।

৩৬। <sup>৷</sup>কোন পুত্র গ্রহণ করা আল্লাহর মর্যাদার পরিপন্থী<sup>১৬৬</sup>। তিনি পরম পবিত্র। তিনি যখন কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত করেন তখন তিনি একে বলেন, 'হও'<sup>১৬৭</sup>। এরপর তা (হতে আরম্ভ করে এবং) হয়েই যায়।

দেখুন : ক. ১৯৪১৫ খ. ১৯৪১৬ গ. ১০৪৬৯; ১৭৪১২; ১৮৪৫; ১৯৪৮৯; ২১৪২৭; ২৫৪৩; ৩৯৪৫।

১৭৬৬। ইহুদী বয়োবৃন্দদের নিকট ইসা (আঃ) যে কথাগুলো বলেছিলেন এবং যা ৩১-৩৪ আয়াতে লিপিবদ্ধ রয়েছে, সেগুলো নিচ্যয়েই কোন শিশুর মুখের কথা হতে পারে না। দৃঢ়তা সহকারে এই সকল ঘোষণা এক বাচ্চার মুখ থেকে নিঃসৃত কতগুলো মিথ্যা উক্তির মত শুনায়। বয়স ও কথার মধ্যে এইরূপ অসামঞ্জস্য ও অসঙ্গতি থাকায় কেউ এগুলোকে সত্য বলে স্বীকার করতে পারে না। সেই সময় ইসা (আঃ) না নবী ছিলেন, না তখন তিনি ইবাদত করতেন বা যাকাত দিতেন, না তাঁকে তখন কিতাব দেয়া হয়েছিল। উপরন্ত এই অলৌকিক ব্যাপারের উল্লেখ ৩৪৭ আয়াতে রয়েছে এইভাবে, ইসা (আঃ) দেলনায় লোকদের সাথে কথা বলেছিলেন এবং পৌঁচ বয়সে। কিন্তু প্রৌঁচ বয়সে মানুষের কথা বলা কোন অলৌকিক ব্যাপার নয়। 'পৌঁচ বয়সে' শব্দের সঙ্গে 'দোলনা' শব্দ যোগ করে কুরআন করীম পরোক্ষভাবে প্রকাশ করছে যে সাধারণে প্রচলিত অর্থে ইসা (আঃ) এর মধ্য বয়সে এবং দোলনায় কথা বলা কোন অলৌকিক ঘটনা ছিল না। কিন্তু তা অলৌকিক ব্যাপার ছিল এই অর্থে যে তিনি শৈশবে এবং প্রৌঁচত্বে ব্যক্তিগৰ্মী বা অসাধারণ আধ্যাত্মিক জ্ঞানগর্ত ও বৃদ্ধিমত্তার কথা বলেছিলেন। এই অনুরূপ দুই শব্দ সমষ্টির সংযোজনে এক ভবিষ্যদ্বাণী নিহিত ছিল যে ইসা ইবনে মরিয়ম (আঃ) যৌবনে মৃত্যুবরণ করবেন না, বরং পরিপূর্ণ বৃদ্ধ বয়স প্রাপ্ত হবেন। এই ভবিষ্যদ্বাণীই প্রকৃত অলৌকিকত্ব প্রকাশ করেছিল। কিন্তু 'মাহদ' শব্দের অন্য অর্থ 'প্রস্তুতিকাল' যা এই শব্দের আর এক অর্থও বটে। যদি এই অর্থ নেয়া হয় তাহলে ৩৪৭ আয়াতের মর্ম হবে, ইসা (আঃ) তাঁর বয়স এবং অভিজ্ঞতার তুলনায় অনেক বেশী উন্নত বৃদ্ধিমত্তা এবং আধ্যাত্মিক জ্ঞানপূর্ণ কথা বলবেন।

১৭৬৭। ইসা (আঃ) এর বৈশিষ্ট্যসূচক নাম 'ইবনে মরিয়ম'। এর দ্বারা একদিকে বিনা পিতায় জন্মের ইঙ্গিত প্রতিভাত, অপরদিকে এর দ্বারা তাঁকে এমন এক নাম প্রদান করা হয়েছে যা অন্য কারো নামের সঙ্গে বিভিন্ন সৃষ্টি করতে অক্ষম। বাইবেল ইসা (আঃ) এর 'ইবনে আদাম' অর্থাৎ 'মনুষ্য পুত্র' বিশেষণ ও ব্যবহার করেছে। কিন্তু এই শেষোক্ত বিশেষণ বা গুণবাচক উক্তি অন্য লোকের জন্মেও ব্যবহার করা হয়েছে। 'ইবনে মরিয়ম' বা মরিয়মের পুত্র সরসরি ইসা (আঃ) এর পার্থক্যসূচক এবং বর্ণনামূলক এক নাম।

১৭৬৮। ধর্মের ইতিহাসে মরিয়মের পুত্র ইসা (আঃ) এর মত সম্ভবত অন্য দ্বিতীয় কোন ব্যক্তি নেই যার সম্পর্কে এত অধিক এবং সুন্দরপ্রসারী মতভেদ বিদ্যমান। ইহুদী, খ্রিস্টান এবং মুসলমান জাতি সকলেই ইসা (আঃ) এর জন্ম, তাঁর মৃত্যুর প্রকার বা অবস্থা এবং তাঁর জীবনের প্রধান ঘটনাসমূহ সম্পর্কে বিরাট মতপার্থক্য পোষণ করে থাকেন।

১৭৬৯। খ্রিস্টানদের বিশ্বাস ইসা (আঃ) আল্লাহর পুত্র ছিলেন। তাদের এই বিশ্বাসের ভিত্তি হলো, বাইবেলে তাঁকে 'খোদার পুত্র' বলা টীকার অবশিষ্টাংশ ও ১৭৭০ টীকা পরবর্তী পুষ্টায় দ্রষ্টব্য

وَ جَعَلَنِي مُبِرَّكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ وَ  
أَذْصَرْنِي بِالنَّصْلَةِ وَ الرَّخْوَةِ مَا دَمَتْ  
حَيَاً  
②

وَ بَرِّا بِوَالدَّيْتِ وَ لَفَرِجَعَلَنِي بَجَارًا  
شَقِيقًا  
②

وَ السَّلَمُ عَلَيَّ يَوْمَ الْيُلْذَثُ وَ يَوْمَ الْأَمْوَثُ وَ  
يَوْمًا بَعْثَ حَيَاً  
②

ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَزِيمَ جَقَوْلُ الْحَقِّ الَّذِي  
فِيهِ يَمْتَرُونَ  
②

مَا كَانَ بِلِوَانَ يَتَخَذِّدُ مِنْ وَلَدٍ هُ سُبْحَنَهُ  
إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ  
فَيَكُونُ  
③

৩৭। আর (ঈসা বললো), ‘নিশ্চয় আল্লাহই আমার প্রভু-প্রতিপালক এবং তাদেরও প্রভু-প্রতিপালক। সুতরাং তোমরা তাঁরই ইবাদত কর। এ-ই হলো সরলসুদৃঢ় পথ।’

৩৮। কিন্তু বিভিন্ন দল নিজেদের মাঝে মতভেদ করলো। সুতরাং একটি বড় দিনে (আল্লাহর সামনে) উপস্থিত হওয়ার বিষয়কে যারা অঙ্গীকার করে তাদের জন্য দুর্ভোগ অবধারিত।

৩৯। যেদিন তারা আমাদের সামনে উপস্থিত হবে (সেদিন) তাদের শুনার শক্তি ও দেখার শক্তি অতি তীক্ষ্ণ হবে<sup>১১১</sup>। কিন্তু যালেমরা আজ প্রকাশ্য বিপথগামিতায় পড়ে রয়েছে।

৪০। আর তুমি <sup>ণ</sup>-পরিতাপের (সেই) দিন সম্পর্কে তাদের সতর্ক কর যখন সব বিষয়ের সিদ্ধান্ত করে দেয়া হবে। কিন্তু এখন তারা উদাসীনতায় পড়ে রয়েছে এবং তারা ঈমান আনে না।

২ ৪১। এ পৃথিবীর এবং এতে যারা রয়েছে নিশ্চয় <sup>ষ</sup>-আমরা  
[২৫] তাদের উত্তরাধিকারী<sup>১১২</sup> হব। আর আমাদের দিকেই তাদের  
৫ ফিরিয়ে আনা হবে।

দেবুন : ক. ৩৯৫২; ৫৯৭৩; ৪৩৬৫ খ. ১৪৯৩; ৩৮২৮; ৫১৯৬১ গ. ২৯১৮; ৬৯৩২; ৩৯৫৭ ঘ. ১৫৪ ২৪; ২৮৯৫৯।

হয়েছে। কিন্তু বাইবেলে অন্যান্য লোককেও ‘খোদার পুত্র’ বলে সম্মোধন করা হয়েছে। সুতরাং এই বিষয়ে ঈসা (আঃ) কোন বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী নন। যদি অন্যান্য আদম সত্ত্বানকে ‘খোদার পুত্র’ বলার পরও তারা খোদার পুত্র না হয়ে থাকলে ঈসা (আঃ) কোন শুক্তি বলে খোদার পুত্র হবেন? অন্যান্যদের সমধেকে বাইবেলের লুক-২০৯৩৬, যিরামিয়-৩১৯, মথি-৬৯, যোহন-৮৯৪১ এবং ইফিয়ীয়-৪৬ দ্রষ্টব্য। এমতাবস্থায় যাদেরকে একইভাবে সম্মোধন করা হয়েছে তাদের মোকাবেলায় ঈসা (আঃ) ও খোদার পুত্র হন না।

১৭৭০। আরবী ভাষায় ‘কুন্ড’ কোন বস্তুকে উপলক্ষ্য করে বলা ছাড়াও গভীর ইচ্ছা প্রকাশনার্থেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এক অভিযানে রসূল করীম (সাঃ) এর খুবই অনুগত এবং অত্যন্ত সাহসী সাহাবী হ্যরত খায়সামাহ (রাঃ) অনুস্থিত ছিলেন। আঁ হ্যরত (সাঃ) তাঁর অনুপস্থিতি গভীরভাবে অনুভব করছিলেন। যুদ্ধের মধ্যে ব্যাপ্ত থাকা অবস্থায় তিনি অনেক দূরে দেখতে পেলেন, একজন অঙ্গীরাহী তাঁর দিকে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে আসছে। আঁ-হ্যরত (সঃ) উচ্চস্থরে বলে উঠলেন, ‘কুন্ড আবা খায়সামাহ’ অর্থাৎ ‘খোদাকরুন তুমি আবু খায়সামাহ হও’। অতএব ‘কুন্ড’ শব্দের মর্ম হবে, আল্লাহ তাআলা যখন চান কোন জিনিস হোক তখন তা হয়ে যায়; অথবা আল্লাহ যখন যেকোন ইচ্ছা প্রকাশ করেন তখন তা সেইরূপ ধারণ করে। শব্দটি এই মতের সমর্থন করে না যে আজ্ঞা এবং বস্তু আদি বা আল্লাহ তাআলার সঙ্গে সম্ভাবে চিরস্তন।

১৭৭১। এই আয়াতের মর্ম এই বুঝায়, শেষবিচারের দিনে অবিশ্বাসীদের দৃষ্টিশক্তি এবং শ্রবণশক্তি অত্যধিক তীক্ষ্ণ ও প্রথর হবে। কারণ সেইদিন তাদের চোখের ও কানের আবরণ ভুলে নেয়া হবে এবং তারা বুবতে পারবে, তারা ভুলের মধ্যে ছিল। কিন্তু এই উপলক্ষ্য অতি বিলম্বে হওয়ার কারণে তা তাদের কোন উপকারে আসবে না।

১৭৭২। এই আয়াতে দৃষ্টি ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে : (ক) খৃষ্টান জাতি প্রথমে পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র রাজত্ব করবে এবং তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা যারা কর্তৃত করতে থাকবে এবং (খ) তাদের অবিশ্বাসের ফলশ্রুতিতে তারা শাসন-ক্ষমতা থেকে বক্ষিত হবে যা শেষ পর্যন্ত ইসলাম ধর্মের অনুসারীদেরকে প্রদান করা হবে।

وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّنَا وَرَبِّكُمْ فَأَغْبَدْنَا مَهْذَا  
صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا<sup>(১)</sup>

فَاخْتَلَفَ الْأَخْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ  
لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مَشْهَدِ يَوْمِ عَظِيمٍ<sup>(২)</sup>

أَشْوَعُهُمْ وَأَبْصَرُهُمْ يَوْمَ يَأْتُونَ  
الظَّلِيمُونَ الْيَوْمَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ<sup>(৩)</sup>

وَآنِي زَهْفَ يَوْمَ التَّشْرِقِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ  
وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ<sup>(৪)</sup>

إِنَّا نَخْنُ تَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِنَّا  
يُرِجِعُونَ<sup>(৫)</sup>

৪২। ক্ষার এ কিতাবে তুমি ইব্রাহীম সম্পর্কেও বর্ণনা কর<sup>১৭৩</sup>। নিচয় সে এক অত্যন্ত সত্যবাদী (ও) নবী ছিল।

৪৩। (স্মরণ কর) সে যখন তার পিতাকে বলেছিল, “হে আমার পিতা! যে শুনে না, দেখে না এবং তোমার কোন কাজেও আসে না তুমি কেন তার উপাসনা কর?

৪৪। হে আমার পিতা! নিচয় আমার কাছে সেই জ্ঞান এসে গেছে যা তোমার কাছে আসেনি। সুতরাং তুমি আমার অনুসরণ কর। আমি তোমাকে সঠিক পথ দেখাবো।

৪৫। হে আমার পিতা! “তুমি শয়তানের উপাসনা করো না”<sup>১৭৪</sup>। নিচয় শয়তান রহমান (আল্লাহর) অবাধ্য<sup>১৭৫</sup>।

৪৬। হে আমার পিতা! আমি অবশ্যই ভয় করছি রহমান (আল্লাহর) পক্ষ থেকে তোমার ওপর না কোন আঘাত নেমে আসে এবং (সে সময়) তুমি না আবার শয়তানের বন্ধু (সাব্যস্ত) হয়ে পড়।

৪৭। সে (অর্থাৎ ইব্রাহীমের পিতা) বললো, ‘তুমি কি আমার উপাস্যদের অবজ্ঞা করছ? হে ইব্রাহীম! তুমি বিরত না হলে নিচয় আমি তোমাকে পাথর মেরে হত্যা করবো’<sup>১৭৬</sup>। আর তুমি দীর্ঘকালের জন্য আমাকে একা ছেড়ে দাও।’

দেখুন : ক. ৩৮:৪৬; ৫৩:৩৮ খ. ৬:৭৫; ২১:৫০; ২৬:৭১; ৩৭:৮৬-৮৭ গ. ৬:১৪৩; ২৪:২২; ৩৬:৬১ ঘ. ২১:৬৯; ২৯:২৫; ৩৭:৯৮।

১৭৭৩। এই কিতাব হলো আল কুরআন। নবী করীম (সাঃ)কে এখানে নির্দেশ দেয়া হয়েছে: ইব্রাহীম (আঃ) এর ব্যাপারে যা কুরআনে উল্লেখিত হয়েছে তা বর্ণনা করার জন্য, বাইবেলের বর্ণনা অনুযায়ী নয়। কুরআন ইব্রাহীম (আঃ)কে সত্যবাদীরূপে বর্ণনা করেছে। বাইবেল তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যা বলার অভিযোগ এনেছে (আদি পুস্তক-২০:১৩)। ইব্রাহীম (আঃ) এর সিদ্ধীক অর্থাৎ পরম সত্যবাদিতার উপর কুরআন খুবই গুরুত্ব আরোপ করেছে, সম্ভবত এই কারণে যে ভবিষ্যতে কোন সময়ে কুরআনের কিছু সমালোচনাকারীও তাঁর প্রতি মিথ্যা আরোপ করবে বলে আশংকা রয়েছে।

১৭৭৪। ‘আবাদা’ ক্রিয়া পদ ‘ইবাদাহ’ থেকে উৎপন্ন। ‘ইবাদাহ’ (অনিদিষ্ট বিশেষ পদ) কেবল আল্লাহ বা প্রতিমার সামনে সিজদা করাই বুঝায় না, অধিকস্তু স্থির মন্তিকে পুঁজুগুঁজুরূপে গভীরভাবে বিচার-বিবেচনা না করে কোন ধারণা বা বিশ্বাস স্থাপন করা অথবা চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই কোন ব্যক্তিকে অঙ্গের মত অনুসরণ করাও বুঝায়। শব্দের শেষোক্ত অর্থ এই আয়াত থেকেই সুস্পষ্ট। কারণ কেউ কোন দিন শয়তানের সম্মুখে সিজদাবন্ত হয়ে তার ইবাদত করতে দেখেনি।

১৭৭৫। তফসীরাধীন আয়াতে-প্রকৃতপক্ষে সম্পূর্ণ সূরাটিতেই ‘শিরক’কে (মূর্তিপূজা) অত্যন্ত কঠোর ভাষায় পুনঃ পুনঃ সুস্পষ্টভাবে দোষারোপ ও নিন্দা করা হয়েছে এবং আল্লাহ তাআলার সিদ্ধত ‘আর রহমান’ অর্থাৎ পরম করণাময়, অ্যাচিত-অসীম দানকারী, বার বার কৃপাকারী হওয়ার উল্লেখ বার বার করা হয়েছে। কারণ শিরক যে কোন জুপে এবং যে কোন প্রকারেই হোক তা আল্লাহ তাআলার ‘রহমানিয়ত’ অর্থাৎ গ্রন্থি অনন্ত অনুগ্রহবাজির অবীকৃতি থেকেই উত্তৃত বা তারই প্রত্যক্ষ ফলশুভ্রতি।

১৭৭৬। ‘রাজামাহ’ শব্দের অর্থ, সে তাকে প্রস্তরাঘাত করতে করতে হত্যা করলো, সে তার বিরুদ্ধে মিথ্যা কলঙ্ক রঁটনা বা অভিযোগ করলো, সে তাকে গালি দিল বা অভিশাপ দিল, সে তাকে তাড়িয়ে দিল, সে তার সঙ্গে সকল সম্বন্ধ ছিন্ন করলো (লেইন)।

وَإِذْ كُنْتِ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ هُدًى لَّهُ كَانَ  
صِدِّيقًا نَّبِيًّا ⑦

إِذْ قَالَ لِإِبْرَاهِيمَ يَا أَبَتِي إِنَّمَا تَعْبُدُ مَا  
يَسْمَمُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ  
شَيْئًا ⑦

يَا أَبَتِي إِنِّي قَدْ جَاءْتِنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا  
لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا  
سَوِيًّا ⑦

يَا أَبَتِي لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ مَا  
كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا ⑦

يَا أَبَتِي إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَمْسَكَ عَذَابَ مَنْ  
الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ دَرِيلًا ⑦

قَالَ أَرَاكَ غَيْبَ آنِتَ عَنِ الْفَهْرِيِّ إِبْرَاهِيمُ هُدًى  
لَّئِنَ لَّمْ تَنْتَهِ كَمْ جَمَّتَكَ وَاهْجَزْنِي  
مَلِيًّا ⑦

৪৮। সে (অর্থাৎ ইব্রাহীম) বললো, ‘তোমার প্রতি শাস্তি  
(বর্ষিত হোক)। আমি \*আমার প্রভু-প্রতিপালকের কাছে  
তোমার জন্য অবশ্যই ক্ষমা প্রার্থনা করবো। নিশ্চয় তিনি  
আমার প্রতি পরম দয়ালু।

৪৯। আর (হে পিতা!) \*আমি তোমাদেরকে এবং আল্লাহ্  
ছাড়া তোমরা যাদেরকে ডাক তাদেরকেও ছেড়ে চলে যাব<sup>۱۹۹</sup>।  
আর আমি আমার প্রভু-প্রতিপালকের কাছে দোয়া করবো।  
আশা করি আমি আমার প্রভু-প্রতিপালকের কাছে দোয়া করে  
বিফল হব না।’

৫০। সুতরাং সে যখন তাদেরকে এবং আল্লাহ্ ছাড়া তারা  
যাদের উপাসনা করতো তাদেরকে ছেড়ে চলে গেল তখন  
\*আমরা তাকে ইসহাক ও ইয়াকুব<sup>۱۹۸</sup> দান করলাম এবং  
(তাদের) প্রত্যেককে আমরা নবী বানালাম।

৩ ৫১। আর আমরা নিজ কৃপায় তাদের ভূষিত করলাম। আর  
[১০] \*আমরা তাদেরকে এক উচুমানের চিরস্থায়ী খ্যাতি দান  
৬ করলাম<sup>۱۹۹</sup>।

৫২। আর এ কিতাবে তুমি মূসা সম্পর্কেও বর্ণনা কর। নিশ্চয়  
তাকে নিষ্ঠাবান করা হয়েছিল। আর সে ছিল এক রসূল (ও)  
নবী<sup>۱۸۰</sup>।

দেখুন ৪ ক. ১৪১১৪; ২৬৪৮৭; ৬০৪৫ খ. ২৯৪২৭ গ. ১৪৪৪০; ২১৪৭৩ ঘ. ২৬৪৮৫; ঙ. ৩৩৪৭০।

১৭৭। এই আয়াতে মনে হয় হ্যরত ইব্রাহীম (আঃ) তাঁর কেনান দেশে হিজরত সম্পর্কে ইশারা করেছেন। তিনি ইরাক ত্যাগ করে  
কেনান গমন করেন এবং সেখান থেকে মিশেরে চলে যান। তিনি তাঁর পিতা এবং তাঁর জাতিকে ইরাকে ছেড়ে গিয়েছিলেন।

১৭৭৮। হ্যরত ইসমাইল (আঃ) এর কোন উল্লেখ এই আয়াতে করা হয়নি যদিও তিনি হ্যরত ইব্রাহীম (আঃ) এর জোষ্টপুত্র ছিলেন।  
হ্যরত ইসহাক ও ইয়াকুব (আঃ) এর উল্লেখ এখানে কেবল অধীনস্থ নবীরূপে করা হয়েছে, অথচ ৫৫৬ আয়াতে হ্যরত ইসমাইলকে  
স্বাধীন ও স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এতে বুঝা যায়, হ্যরত ইসহাক ও ইয়াকুব থেকে হ্যরত ইসমাইল আধ্যাত্মিক মর্যাদায় উচ্চতর  
স্তরে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

১৭৭৯। ‘জা’য়াল্না লাহুম লিসানা সিদ্কীন আলিয়া’ (আমরা তাদেরকে এক উচুমানের চিরস্থায়ী খ্যাতি দান করলাম) এর মর্মঃ (১)  
তারা যথেষ্ট খ্যাতি বা সুনাম অর্জন করেছিল এবং তাদেরকে তাদের সমসাময়িক এবং ভাবী বংশধরেরা শুন্দা, স্নেহ ও ভালবাসার সাথে  
স্মরণ করতো। (২) তাদের কথাবার্তা বুদ্ধিমত্তা ও জ্ঞানপূর্ণ ছিল এবং তিক্ততা, অশ্বীলতা, মিথ্যা ও ঘৃণামুক্ত ছিল। (৩) তারা নিজেদের  
বিশ্বাস প্রকাশে নির্ভীক ছিল, মিথ্যাবাদী এবং অবিশ্বাসীদের প্রতি কঠোর ছিল। (৪) তাদের প্রতিষ্ঠিত ভাল কর্মগুলোর সুনাম বা সুখ্যাতি  
বহু স্মৃতিসৌধ ও স্মৃতিস্তরূপে বিরাজ করছিল।

১৭৮০। ‘সে ছিল এক রসূল (ও) নবী’ এই শব্দগুলো প্রচলিত এই ভুল ধারণার অপমোদন করে যে রসূল –যিনি নৃতন শরীয়ত বা  
কিতাব নিয়ে আসেন এবং নবী –যিনি কেবল মানবের সংক্ষার সাধনের জন্য আল্লাহ্ তাআলার প্রত্যাদিষ্ট হয়ে থাকেন, যদিও একজন  
রসূলের মতই এক নবী ও ওহী-ইলহাম পেয়ে থাকেন, তথাপি তিনি নৃতন বিধান বা আদেশ সঞ্চালিত কোন নৃতন কিতাব নিয়ে আসেন  
না। সাধারণভাবে প্রচলিত এই ধারণানুযায়ী প্রত্যেক রসূলই নবী কিন্তু প্রত্যেক নবী রসূল নন। তফসীরাধীন আয়াত এই ভাস্ত ধারণাকে  
নস্যাত করে দিয়েছে। কারণ যদি একজন রসূল নতুন শরীয়ত বহন করার কারণে তিনি অবশ্যই নবী, তাহলো এখানে ও অন্যান্য আয়াতে

قَالَ سَلِّمَ عَلَيْكَ جَسَاسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّيْنِ  
إِنَّهُ كَانَ بِنِ حَفِيْيَا<sup>⑩</sup>

وَأَعْتَزِلُ كُمْدَ مَاتَذْعُونَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ  
وَأَذْعُوا رَبِّيْنِ زِيْ عَسَى آلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ  
رَبِّيْنِ شَقِيْيَا<sup>⑪</sup>

فَلَمَّا اغْتَزَ لَهُمْ رَمَّ مَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُوْنِ  
اللَّهِ وَهَبَنَا لَهُ إِشْحَقَ وَيَغْفُوْبَ دَوْ  
كُلَّا جَعَلْنَا نَبِيًّا<sup>⑫</sup>

وَهَبَنَا لَهُمْ قِنْ (َخَمْرَتَنَادَجَعَلَنَا لَهُمْ  
لِسَانَ صَدِّقِ عَلِيًّا<sup>⑬</sup>

وَادْكُزْ فِي الْكِتَبِ مُؤْسَى زِإِنَّهُ كَانَ  
مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُوْلَ نَبِيًّا<sup>⑭</sup>

৫৩। আর আমরা তাকে তুর পর্বতের কড়ান পাশ<sup>১৮১</sup> থেকে ডাক দিলাম এবং একান্তে আলাপনের মাধ্যমে তাকে নেকট্য দিলাম।

৫৪। আর আমরা তাকে নিজ কৃপায় তার ভাই হারুনকে নবী হিসাবে দান করলাম।

৫৫। আর এ কিতাবে ইসমাইল<sup>১৮২</sup> সম্পর্কেও বর্ণনা কর। নিচয় সে ছিল প্রতিশ্রুতি পালনে সত্যপরায়ণ। আর সে ছিল রসূল (ও) নবী।

৫৬। আর <sup>গ</sup>সে তার পরিবারপরিজনকে নামায ও যাকাত (আদায় করার) নির্দেশ দিত। আর সে তার প্রভু-প্রতিপালকের কাছে খুবই সন্তোষভাজন ছিল।

৫৭। আর এ কিতাবে তুমি ইদ্রীস সম্পর্কেও বর্ণনা কর<sup>১৮৩</sup>। নিচয় সে ছিল অত্যন্ত সত্যবাদী (ও) নবী।

وَتَادِينَهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيَمْمَى  
وَقَرَبَنَهُ نَجِيًّا<sup>(১)</sup>

وَهَبَنَا لَهُ مِنْ دَحْمَتِنَا آخِيَّةُ هُرُونَ  
نَبِيًّا<sup>(২)</sup>

وَأَذْكُرْفِ الْكِتَبِ إِسْمَعِيلَ زَيْنَهُ كَانَ  
صَادِقَ الْوَعْدِ كَانَ رَسُولًا نَبِيًّا<sup>(৩)</sup>

وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالرَّكُوٰةِ  
وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا<sup>(৪)</sup>

وَأَذْكُرْ فِي الْكِتَبِ إِذْرِيسَ زَيْنَهُ كَانَ  
صَدِيقًا نَبِيًّا<sup>(৫)</sup>

দেখুন : ক. ২০৪৮১; ২৮৩১; খ. ২০৪৩০, ৩১; ২৫৪৩৬; ২৮৪৩৬; গ. ২০৪১৩৩; ৩৩৪৩৪।

রসূল শব্দের সঙ্গে 'নবী' শব্দের সংযুক্তি অনাবশ্যক এবং অযৌক্তিক। প্রকৃত কথা হলো, প্রত্যেক রসূলই নবী এবং প্রত্যেক নবীই রসূল। এই দুটি পদ অভিন্ন এবং একই পদের দুটি অবস্থা বুবায় এবং একই ব্যক্তির দুটি কর্তব্য বুবায়। একজন ঐশ্বী সংক্ষারক যখন আল্লাহ তাআলার নিকট থেকে সংবাদ পেয়ে থাকেন তখন তিনি রসূল (রিসালাত অর্থ বাণী) এবং তিনিই নবী এই অর্থে যে প্রাণ বাণীসমূহ তিনি তাঁর জাতির লোকের নিকট প্রচার করেন যাদের প্রতি তিনি প্রেরিত হন (নবুওয়ত অর্থ বাণী বহন করা)। সুতরাং প্রত্যেক রসূলই নবী। কারণ আল্লাহ তাআলার নিকট থেকে ওহী পেয়ে তিনি তা তাঁর জাতি বা জনগণের নিকট প্রচার করেন এবং প্রত্যেক নবীই রসূল। কেননা তিনি তাঁর জাতির নিকট সেই সব ওহী বা ঐশ্বীবাণী পৌছে দেন যা তিনি আল্লাহ তাআলার নিকট থেকে পেয়ে থাকেন। রেসালতের কাজ আগে নবুওয়তের কাজ পরে। রসূলের মর্যাদায় প্রথমে তিনি ঐশ্বীবাণী লাভ করে থাকেন এবং নবীরূপে তিনি প্রাণ বাণীসমূহ তাঁর জনগণের নিকট প্রচার করেন। অতএব এই আয়াত এবং কুরআন করীমের যেসব স্থানে রসূল এবং নবী শব্দম্বয় একত্রে এসেছে সে সব স্থানেই অর্থাৎ প্রত্যেকবারই 'নবী' শব্দ 'রসূল' শব্দের পরে এসেছে। কেননা এটাই স্বাভাবিক বিন্যাস।

১৭৮১। এই আয়াতের এই শব্দগুলোর অর্থঃ—(ক) পর্বতের দক্ষিণ দিক (কিনারা) থেকে, (খ) পর্বতের আশীর্বাদপ্রাপ্ত প্রান্ত থেকে, (গ) পবিত্র বা মহিমাভিত পর্বত থেকে।

১৭৮২। হ্যরত মূসা (আঃ) এর পরে হ্যরত ইসমাইল (আঃ) এর উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁর সম্বন্ধে বলতে গিয়ে 'ওয়ায়কুর' (এবং উল্লেখ কর) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এতে প্রতিভাত হয়, ধর্মের ইতিহাসে একটি অধ্যায় অর্থাৎ ইসরাইলী বংশধারার সমষ্টি ঘটেছে এবং এক নৃতন অধ্যায়ের অর্থাৎ ইসমাইলী বংশধারার সূচনা হয়েছে।

১৭৮৩। কুরআন শরীফের অধিকাংশ তফসীরকারক এই অভিন্ন মত পোষণ করেন, হ্যরত ইদ্রীস (আঃ) বাইবেলে উল্লেখিত 'ইনোক' ছাড়া অন্য কেউ নন। হনুক (ইনোক) এবং ইদ্রীস শব্দম্বয় অর্থে ও মর্মে পরম্পর খুবই সাদৃশ্যপূর্ণ। যেমন ইদ্রীস শব্দের অর্থ যে ব্যক্তি বেশী পাঠ করে বা বেশী উপদেশ দান করে, আর 'হনুক' শব্দের অর্থ উপদেশ বা একান্ত নিয়োজিত বা উৎসর্জন (এনসাইক. বিব.)। অধিকস্তু ইনোক সম্পর্কে বাইবেল এবং ইহুদী ধর্মীয় গ্রন্থাবলীতে যা বর্ণিত রয়েছে তা হ্যরত ইদ্রীস (আঃ) সম্বন্ধে কুরআন করীমের বর্ণনার সঙ্গে অত্যন্ত সাদৃশ্যপূর্ণ। আরো দেখুন 'দি লারজার এডিশন অব দি কমেন্টারি' ১৫৯৭-৯৮ পৃষ্ঠা।

৫৮। আর ক্ষেত্রে আমরা তাকে এক অতি উচ্চ মর্যাদায় উন্নীত করেছিলাম।

৫৯। এরাই সেইসব লোক যাদেরকে আল্লাহ পুরস্কৃত করেছিলেন। এরা আদমের বংশধরদের মাঝ থেকে নবী ছিল। আর (এরা) তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিল যাদেরকে আমরা নুহের সাথে (নৌকায়) উঠিয়েছিলাম। আর (এরা) ইব্রাহীম ও ইসরাইলের<sup>১৮৪</sup> বংশধরদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। আর (এরা) তাদেরও অন্তর্ভুক্ত ছিল যাদেরকে আমরা হেদায়াত দিয়েছিলাম  
৬০। এবং মনোনীত করেছিলাম। রহমান (আল্লাহর) আয়াতসমূহ  
জ্ঞ এদেরকে "যখন পড়ে শুনানো হতো (তখন) এরা সিজদাহ  
করতে করতে এবং কাঁদতে কাঁদতে লুটিয়ে পড়তো।

৬০। কিন্তু এদের পরে এমন বংশধর (এদের) স্থলাভিষিক্ত হলো, যারা নামায বিনষ্ট করে ফেললো<sup>১৮৫</sup> এবং কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করলো। সুতরাং তারা অবশ্যই বিপথগামিতার পরিণতির মুখোমুখী হবে।

৬১। তবে যারা তওবা করে, স্ট্রান্ড আনে এবং সৎকাজ করে<sup>১৮৬</sup> তাদের কথা ভিন্ন। এরাই জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং এদের ওপর কোন অবিচার করা হবে না,

وَرَفِعْنَاهُ مَكَانًا عَلَيْهَا<sup>১</sup>

أُولَئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمْ قِنَّ  
الثَّيْنَ مِنْ ذُرَيْتَهُ أَدْمَرَهُ وَمَقَنَ حَمَلَنَّا  
مَهَ نُؤْجِزَ وَمِنْ ذُرَيْتَهُ إِبْرَاهِيمَ وَ  
إِسْرَائِيلَ رَ وَمَقَنَ هَدَنَّا وَاجْتَبَيْنَاهُ  
إِذَا شُتِّلَ عَلَيْهِمْ أَيْتُ الرَّحْمَنَ  
خَرُّوا سَجَدًا وَبِكَيْا<sup>২</sup>

وَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَأَعُوا  
الصَّلَوةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهْوَةَ فَسَوْفَ  
يَلْقَوْنَ عَيْنَاهُ<sup>৩</sup>

إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا  
فَأُولَئِكَ يَذْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا  
يُظْلَمُونَ شَيْئًا<sup>৪</sup>

দেখুন : ক.২৪২৫৪; ৪৪১৫৯ খ. ১৪৭; ৪৪৭০; ৫৪২১; ৫৭৪২০ গ. ১৭৪১০৮, ১১০; ৩২৪১৬ ঘ. ৭৪১৭০ ঙ. ৬৪৪৯; ১৮৪৪৯; ২৫৪৭১; ৩৪; ৩৮।

১৭৪৪। কুরআন করীমের কোন কোন তফসীরকার মনে করেন 'আদমের বংশধরদের মাঝ থেকে' উক্তিটি হ্যরত ইন্দীস (আঃ)কে বুবায় এবং 'যাদেরকে আমরা নুহের সাথে (নৌকায়), উঠিয়েছিলাম' বাক্যাংশ হ্যরত ইব্রাহীম (আঃ) এর প্রতি ইশারা করে। এই শব্দগুলো যথা 'ইব্রাহীম ও ইসরাইলের বংশধরদের অন্তর্ভুক্ত ছিল', ইব্রাহীমের বংশধর দ্বারা ইসমাইল, ইসহাক এবং ইয়াকুব (আঃ)কে ইথগিত করে এবং ইসরাইল শব্দের পূর্বে বংশধর থেকে কথাগুলো উহ্য রয়েছে এবং তা হ্যরত মূসা, হারুন, যাকারিয়া, ইয়াহুদিয়া এবং ঈসা (আঃ)কে বুবিয়েছে, যাদের সকলের সঙ্গে বর্তমান স্রায় পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে উল্লেখিত হয়েছে।

১৭৪৫। প্রকৃতপক্ষে নামাযের প্রতি অবহেলা ও অমনোযোগ মানুষকে ঐশ্বী শুণাবলী সম্পর্কে অভ্যর্তার তিমিরে ঠেলে দেয় এবং সৃষ্টিকর্তার সঙ্গে সবক্ষ স্থাপনের আকাঙ্ক্ষাকে মেরে ফেলে, যার ফলশ্রুতিতে সে শয়তানের কবলে নিষ্ক্রিয় হয়। যখন ঐশ্বী অনুগ্রহের সাহায্য পাওয়ার জন্য মিনতিতে এবং আল্লাহ তাআলার নিকট প্রার্থনায় অবহেলা ও শৈথিল্য বিফলতা আনে তখন অসৎ বাসনা-কামনার অনুসরণ করার ফলে সত্য ও জ্ঞানের প্রতি অনীহা সৃষ্টি হয়, অশ্঵ীল ও অলস অভীষ্ট লাতের চেষ্টা প্রশ্রয় পায় এবং এই সমস্ত কিছু একত্রে যুক্ত হয়ে ব্যক্তির নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক অবস্থাকে সম্মুখে ধ্বংস করে ফেলে।

১৭৪৬। 'সৎকাজ' এই গুণবাচক উক্তি ভক্তিমূলক কাজের অপেক্ষা সেই কাজের জন্য অধিক প্রযোজ্য যা সঠিক স্থানে ও সময়ে প্রযোগী এবং জরুরী অবস্থা অনুযায়ী করা হয়।

৬২। ۴. সেই চিরস্থায়ী জান্নাতসমূহে, যেগুলো সম্পর্কে রহমান (আল্লাহ) নিজ বান্দাদেরকে (এমতাবস্থায়) প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন (যখন সেগুলো তাদের) দৃষ্টির অগোচরে<sup>۱۷۸</sup> রয়েছে। নিশ্চয় তাঁর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হয়েই থাকে।

৬৩। ۵. সেখানে তারা কেবল শান্তির (বাণী) ছাড়া কোন বাজে (কথা) শুনবে না। আর সেখানে সকালসন্ধ্যা তাদেরকে তাদের রিয়্ক দেয়া হবে।

৬৪। ۶. এ হলো সেই জান্নাত, যার উত্তরাধিকারী আমরা আমাদের বান্দাদের মাঝে থেকে মুন্তাকীদের করবো।

৬৫। আর (ফিরিশ্তারা বলবে), ‘আমরা তোমার প্রভু-প্রতিপালকের আদেশেই অবতরণ করে থাকি। আমাদের সামনে ও আমাদের পিছনে যা আছে এবং যা এর মাঝে আছে (সব কিছু) তাঁরই। আর তোমার প্রভু-প্রতিপালক কখনো বিস্মৃত হন না।

৬৬। ۷. আকাশসমূহের ও পৃথিবীর এবং এ দুয়ের মাঝে যা-ই আছে (তিনিই) এর প্রভু-প্রতিপালক। সুতরাং তুমি তাঁরই ৮ ইবাদত কর এবং তাঁর ইবাদতে ধৈর্যের সাথে প্রতিষ্ঠিত থাক।  
[১৪] ৭ তুমি কি তাঁর (সম) নামে অন্য কাউকে চিন?

৬৭। আর মানুষ বলে<sup>۱۷۹</sup>, ۸. ‘আমি মরে যাওয়ার পরও কি আবার আমাকে জীবিত করে উঠানো হবে?’

৬৮। মানুষ কি স্মরণ করে না, ۹. আমরা এর পূর্বেও তাকে এমন অবস্থা থেকে সৃষ্টি করেছি যখন সে কিছুই<sup>۱۸۰</sup> ছিল না!

দেখুন ১. ক. ১৪:৭২; ১৩:২৪, ৬১:১৩ খ. ৫২:২৪, ৫৬:২৬, ৭৮:৩৬ গ. ৭৪:৪৪, ৮৩:৭৩, ৫২:১৮ ঘ. ৩৭:৬, ৩৮:৬৭, ৪৪:৮, ৭৮:৩৮ ঙ. ২৩:৩৮, ৩৬:৭৯ চ. ১৯:১০, ৭৬:২

১৭৮। ‘বিল গায়ের’ উক্তির মর্ম এরপও হতে পারে, মু’মিন ‘চিরস্থায়ী জান্নাত বা বাগানের’ অধিকারী হবে। কারণ তারা অদ্যের প্রতি দ্বিমান এনেছিল, যা তারা দেখতে পায় নি-যথাঃ আল্লাহ, ফিরিশ্তা, পরকাল বা পারলোকিক জীবন, ইত্যাদি।

১৭৮। ‘আল ইনসান’ বলতে সাধারণ অর্থে এখানে সকল মানুষ বুঝায় না, এক বিশেষ শ্রেণীর মানুষ বুঝায়, যারা মৃত্যুর পরে পারলোকিক জীবনের অঙ্গিতে সন্দেহ পোষণ করে। অকৃতপক্ষে পৃথিবীতে খুব অল্প সংখ্যক লোকই আছে যারা পরলোকের অঙ্গিত সম্পর্কে অঙ্গীকার করে, মুখের কথা দ্বারা নয়, বরং তাদের অকৃত আচরণ ও কাজকর্ম দ্বারা, অর্থাৎ একমাত্র পার্থিব অভিষ্ঠ লাভের চেষ্টায় সম্পূর্ণ নিমগ্ন হওয়া দ্বারা মৃত্যুর পরে জীবনের প্রতি সন্দেহ বা অঙ্গীকৃতি প্রকাশ করে।

১৭৯। কোন বস্তুই, উল্লেখযোগ্য কিছুই, কোন মূল্যই বা কোন গুরুত্বই। এই অর্থ ৭৪:২ আয়াত দ্বারা সমর্থিত।

جَئْتَ عَذْنَ إِلَيْنِي وَعَدَ الرَّحْمَنُ  
عِبَادَةً بِالْغَنِيَّةِ إِنَّهُ كَانَ وَعْدَهُ  
مَأْتَيْنَا<sup>۱۸۱</sup>

لَا يَشْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلَّا سَلَمًا وَ  
لَهُمْ رِزْقٌ مِّنْهَا بِخَرَةٍ وَعَيْشَيْنَا<sup>۱۸۲</sup>

تَلَكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عَبَادِنَا  
مَنْ كَانَ تَقْيَيْنَا<sup>۱۸۳</sup>

وَمَا تَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ جَلَّهُ مَا بَيْنَ  
آيَيْدِيْنَا وَمَا خَلَقْنَا وَمَا بَيْنَ ذِلِّكَ جَ  
وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيَّنَا<sup>۱۸۴</sup>

رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا  
فَاغْبُدْهُ وَاضْطَبِرْ لِعْبَادَتِهِ وَهَلْ  
تَعْلَمُ لَهُ سَمِيَّا<sup>۱۸۵</sup>

وَيَقُولُ الْأَرْدَنْسَانُ إِذَا مَا يُشْ لَسْوَفَ  
أُخْرَجَ حَيَّا<sup>۱۸۶</sup>

أَوَلَيْدَ كُرْأَلْدَنْسَانُ آتَانَا خَلْقَنَهُ مِنْ قَبْلِ  
وَلَمْ يَكُ شَيْئَا<sup>۱۸۷</sup>

৬৯। অতএব তোমার প্রভু-প্রতিপালকের কসম, কামরা তাদের এবং শয়তানদেরও অবশ্যই একত্র করবো। এরপর জাহানামের চারপাশে নতজানু অবস্থায় আমরা তাদের অবশ্যই উপস্থিত করবো<sup>১৯০</sup>।

★ ৭০। তখন<sup>১৯১</sup> আমরা প্রত্যেক দল থেকে অবশ্যই তাদের টেনে বের করে আনবো, যারা রহমান (আল্লাহর) অবাধ্যতায় সবচেয়ে বেশি কঠোর ছিল।

৭১। আর<sup>১৯২</sup> তাদের মাঝে যারা আগুনে দক্ষ হওয়ার বেশি যোগ্য<sup>১৯৩</sup> আমরাই তাদের ভালভাবে জানি।

৭২। আর ক্ষেত্রে তোমাদের (অর্থাৎ যালেমদের) প্রত্যেককেই<sup>১৯৪</sup>-ক এতে নামতে হবে। এ হলো তোমার প্রভু-প্রতিপালকের অমোঘ সিদ্ধান্ত।

দেখুন : ক. ১০৪২৯, ১৭৫১৮, ৩৪৪১ খ. ২১৫৯

১৭৯০। 'জাহানাম' শব্দ হিন্দু ভাষাতে 'জেহেন্নু' রূপে ব্যবহৃত। আদিতে আরম্ভীয় ভাষায় তা 'হিন্নোম' রূপে ব্যবহৃত হতো। পরবর্তীকালে 'জি-হিন্নামে' পরিবর্তিত রূপ নেয় (এনসাইক. বির.) যার অর্থ মৃত্যু বা ধর্মের উপত্যকা। এই শব্দ 'জাহানাম' (অর্থ: সে নিকটে গেল) এবং 'জাহান্ম' (অর্থ: তার চেহারা কুণ্ঠিত হলো) এই দুই শব্দের যুক্ত শব্দও হতে পারে। অতএব জাহানাম কোন বস্তু বা স্থান বুঝাতে পারে যা কোন ব্যক্তি প্রথমে পছন্দ করে। কিন্তু যখন সে তার নিকটবর্তী হয় তখন তা অপছন্দ করে এবং ক্রুশিণ্ঠ করে তার প্রতি বিরূপভাব প্রকাশ করে। এইরূপে জাহানাম শব্দের গঠন-শৈলীই দোষখের প্রকৃতি এবং বৈশিষ্ট্য বিশদভাবে বর্ণনা করে।

১৭৯১। সুম্মা (অর্থ: তখন 'অর্থাৎ, তৎপর') শব্দ একটি অব্যয় বা সংযোগমূলক অব্যয়, বিন্যাস এবং বিলম্ব বুঝাবার জন্য ব্যবহৃত হয়, কার্যকর ক্ষমতাসম্পন্ন আদেশের জন্য নয়। এর অর্থ এবং, সুতরাং হয়ে থাকে (লেইন)।

১৭৯২। এই আয়াতে 'সুম্মা' শব্দ ঘোষণামূলক আদেশ বুঝাতে অব্যয়রূপে ব্যবহৃত হয়েছে, হকুম রূপে ব্যবহৃত হয়নি এখানে এর অর্থ হবে 'এবং'। এখানে এই শব্দের মর্ম এবং তার একটি বিষয় আমরা তোমাদেরকে বলবো যে.....

১৭৯৩। এই শব্দগুলোর মর্মার্থ হতে পারেং: (ক) যারা বাইরে না থেকে আগুনের মধ্যেই দক্ষ হওয়ার জন্য অধিক উপযুক্ত, (খ) যারা অন্যান্যদের অপেক্ষা অগ্নিদক্ষ হওয়ার জন্য বেশী উপযোগী, (গ) যারা অন্য কোন উপায় ছাড়া অগ্নিকুণ্ডে নিষিদ্ধ হয়ে বেশী শাস্তি পাওয়ার যোগ্য।

১৭৯৩-ক। 'মিনকুম' শব্দের মধ্যে 'কুম' সর্বনাম সাধারণভাবে ব্যবহৃত হয়নি। বর্ণনার প্রসঙ্গানুযায়ী এটা অবিশ্বাসীদের এবং পরকালের অস্তিত্বে সদেহপোষণকারী যারা, কেবল তাদের প্রতি প্রযোজ্য। এই সকল লোকের বিষয়ই পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে বিবৃত হয়েছে। ইবনে আবাস এবং ইকরামা (রাও) এর অন্য এক বর্ণনা 'মিনহুম' (তোমাদের মধ্য থেকে) 'মিনহুম' (তাদের মধ্য থেকে) রূপে বর্ণিত হয়েছে এবং হযরত ইবনে আবাস বলেছেন, 'মিনকুম' উক্তি অবিশ্বাসীদের প্রতি করা হয়েছে (কুরতুবী)। সুতরাং ৬৭-৭১ আয়াতে উল্লেখিত অবিশ্বাসীদের প্রতিই 'কুম' (তোমরা বা তোমাদের) স্পষ্টভাবে নির্দেশ করছে। অপরপক্ষে কুরআন করীম সুস্পষ্ট এবং জোরের সাথে এই মতের সমর্থন করে, ধর্মপরায়ণ বিশ্বাসীগণ কখনো দোষখে যাবেন না। তারা সর্বদা আল্লাহ তাআলার ভালবাসা ও অনুগ্রহের আলোতে অবগাহন করবে (২৭:৯০; ৩৯:৬২; ৪৩:৬৯; ইত্যাদি) এবং জাহানাম থেকে বহুদূরে অবস্থান করবে এবং তার ক্ষীণতম শব্দও তাদের কানে পৌছবে না (২১:১০২-১০৩)। কিন্তু যদি মুমিন এবং কাফির উভয়কে 'কুম' (তোমাদের) এর অস্তর্ভুক্ত করে নেয়া হয় তাহলে কাফিরদের ক্ষেত্রে আয়াতের অর্থ হবে, তারা সকলেই জাহানামে যাবে এবং মুমিনগণের ক্ষেত্রে আয়াতে ইশারাকৃত দোষখের মর্ম হবে ইহজীবনে যে পরীক্ষা ও মানসিক যন্ত্রণারূপ অগ্নির মধ্য দিয়ে তাদেরকে অতিক্রম করতে হয় এবং যা অত্যন্ত দৃঢ়তাপূর্ণ ধৈর্যের সঙ্গ সহ্য করতে হয় এবং যার মধ্য থেকে পরিগামমুক্ত তাদেরকে বের করে এনে শাস্তি এবং জানাতের সুবের মধ্যে ছেড়ে দেয়া হয়, যেমন তা পরবর্তী আয়াতেও প্রতিভাত হয়েছে। আঁ হ্যরত (সাঃ) নিজে এই আয়াতের ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তাঁর স্তু হাফ্সা (রাও) থেকে বর্ণিতঃ একদা যখন

টাকার অবশিষ্টাংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

فَوَرِّيَكَ لَنَخْسِرَ تَهْمَةً الشَّيْطَنَ شَمَّ  
لَنُخْضِرَ تَهْمَهُ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِئْيَا<sup>১৯৫</sup>

شَمَّ لَتَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شَيْئَعَةٍ آيَهُمْ  
أَشَدُ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتْيَانٌ<sup>১৯৬</sup>

شَمَّ لَنَخْنَ أَغْلَمُ بِالذِّينَ هُمْ أَذْلُّ بِهَا  
صِلْيَا<sup>১৯৭</sup>

وَلَمْ يَمْكُفْ رَآلاً وَارِدُ هَاجَ كَانَ عَلَى  
رِّيَكَ حَشْمًا مَقْضِيَا<sup>১৯৮</sup>

৭৩। \*এরপর আমরা মুত্তাকীদের রক্ষা করবো এবং যালেমদের নতজানু অবস্থায় এতে ছেড়ে দিব।

৭৪। আর আমাদের সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ<sup>১৯৪</sup> যখন তাদের পড়ে শুনানো হয় তখন যারা অস্মীকার করেছে তারা মুমিনদের বলে, ‘উভয় দলের মাঝে কোনটি পদমর্যাদার দিক দিয়ে উভয় এবং সঙ্গীসাথীর দিকে থেকে বেশি ভাল’?

৭৫। আর \*আমরা তাদের পূর্বে কত প্রজন্মাকেই ধ্বংস করে দিয়েছি, যারা সাজসরঞ্জাম ও বাহ্যিক আড়ম্বরের দিক থেকে (তাদের চেয়ে) অধিক (সঙ্গতিসম্পন্ন) ছিল।

৭৬। তুমি বল, ‘যারা বিপথগামিতায় পড়ে আছে রহমান (আল্লাহ) তাদের কিছুটা অবকাশ দিয়ে থাকেন। \*অবশেষে যার প্রতিশ্রূতি তাদের দেয়া হয়ে থাকে তারা যখন তা দেখবে, তা আয়াব হোক বা কিয়ামতের মুহূর্ত হোক<sup>১৯৫</sup>, তখন তারা অবশ্যই জানতে পারবে মর্যাদার দিক থেকে কে অধিক নিকৃষ্ট এবং জনবলের দিক থেকে কে সর্বাপেক্ষা দুর্বল ছিল।

৭৭। \*আর যারা হেদায়াত পেয়েছে আল্লাহ তাদেরকে হেদায়াতে আরও উন্নতি দিবেন। \*আর স্থায়ী সংকাজসমূহ তোমার প্রভু-প্রতিপালকের দ্রষ্টিতে পুরক্ষারের দিক থেকে উভয় এবং পরিণামের দিক থেকেও উভয়।

দেখুন : ক. ২১:১০২, ৩৯:৬২ খ. ৬:৭, ১৭:১৮, ১৯:৯৯, ২১:১২, ৩৬:৩২, ৫০:৩৭ গ. ৭২:২৫ ঘ. ৯:১২৪, ৪:১২৪, ৪:১৮, ৪:৪৫ ঙ. ৮:৭:১৮

নবী করীম (সাঃ) বলছিলেন, তাঁর ঐ সকল সাহাবা দোষখে যাবেন না, যারা বদরের যুদ্ধে বা ওহদের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিলেন তখন আমি এই আয়াতের প্রতি আঁ হ্যুর (সাঃ) এর মনোযোগ আর্কর্ণ করলে এর ভূল অর্থ করার জন্য তিনি আমাকে মৃদু তিরক্ষার করলেন এবং বললেন, ‘পরবর্তী আয়াত পাঠ কর’ (মুসলিম, জামীউল বায়ানে উল্লেখিত)। রসূল করীম (সাঃ) এর পবিত্র স্তু হাফসা (রাঃ)কে পরবর্তী আয়াত ৭৩ এর প্রতি নির্দেশ দ্বারা বুঝা যায়, আঁ হ্যুর (সাঃ)ও উক্ত আয়াতে ব্যবহৃত সুস্থা অংশের অর্থ সংযোজনকারী ‘এবং’ বুঝেছিলেন এবং পরবর্তী আয়াতকে বাধীন ও পৃথক ধারা বলে জানতেন। নতুনা তিনি হ্যরত হাফসা (রাঃ)কে তফসীরাধীন আয়াতের ভূল অর্থ বুঝার কারণে তিরক্ষার করতেন না।

১৭৯৪। ‘নির্দর্শন’ কেবল কোন বস্তুর অস্তিত্ব, এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে বুঝি, অভিজ্ঞতা ও যুক্তিভি ওক বিচার দ্বারা প্রমাণ ও প্রতিষ্ঠিত করে। কিন্তু ‘সুস্পষ্ট নির্দর্শন’ হলো সেই সব প্রতীক-চিহ্ন বা যুক্তি যা কেবল কোন কিছুর অস্তিত্বকেই নির্দেশ এবং প্রমাণ করে না, বরং তা সম্পূর্ণ সময়োপযোগী এবং যুগ-সমস্যাবলীর প্রমাণে যথোচিত এবং যা সৎ ও মহিমাভিত্তি উদ্দেশ্য সাধনকল্পে সেই সব উভয়ভাবে সমাধা করে থাকে।

১৭৯৫। এখানে ‘আয়া’ শব্দের দ্বারা শেষ ধ্বংসের পূর্বে কাফিরদের উপর সময় সময় মধ্যবর্তী শাস্তির কথা বুঝাতে পারে এবং ‘আস্মায়াত’ দ্বারা কাফিরদের সম্পূর্ণ এবং সর্বশেষ ধ্বংসের কথা বুঝাতে পারে।

ثُمَّ تُنَجِّي الَّذِينَ آتَقْنَا وَ تَذَرُّ  
الظَّلِيمِينَ فِيهَا جِئْنًا<sup>১৭</sup>

وَإِذَا تُشْلِي عَلَيْهِمْ أَيْتَنَا بَيْتَنِتْ قَاتَّ  
الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ أَمْنَوْا هَآيٌ  
الْفَرِيقَيْنِ حَيْرَ مَقَامًا وَأَخْسَنْ تَدْرِيَّا<sup>১৮</sup>

وَكَمْ آهَلَنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَزْنِ هُمْ  
أَخْسَنْ آثَارًا وَرِغَيْ<sup>১৯</sup>

قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلَيَمْذَدَ لَهُ  
الرَّحْمَنُ مَدَّاهَ حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا  
يُؤْعَذُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ  
فَسَيَغْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرُّ مَكَانًا وَأَصْعَفُ  
جُنَاحًا<sup>২০</sup>

وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَ  
الْبِقِيلَتُ الصِّلْحَتُ حَيْرَ يَنْهَى رَبِّكَ  
شَوَّابًا وَ حَيْرَ مَرَدًا<sup>২১</sup>

৭৮। তুমি কি তার স্পর্কে ভেবে দেখেছ, যে আমাদের নির্দশনাবলী অঙ্গীকার করে এবং বলে, ‘আমাকে অবশ্যই প্রচুর ধনসম্পদ এবং সন্তানসন্ততি দেয়া হবে’<sup>১৯৬</sup>?

৭৯। সে কি অদৃশ্যের সংবাদ পেয়েছে অথবা রহমান (আল্লাহর) কাছ থেকে কোন অঙ্গীকার আদায় করে নিয়েছে?

৮০। এমনটি কখনো হবে না<sup>১৯৭</sup>। সে যা বলে আমরা তা অবশ্যই লিখে রাখবো এবং তার জন্য আযাব দীর্ঘায়িত করতে থাকবো।

৮১। আর যা কিছুর কথা সে (সগর্বে) বলছে আমরা এর উত্তরাধিকারী হয়ে যাব<sup>১৯৮</sup> এবং সে আমাদের কাছে একাকীই আসবে।

৮২। <sup>ণ</sup>আর তারা আল্লাহকে ছেড়ে (অন্যদেরকে) উপাস্য বানিয়ে রেখেছে যেন এরা তাদের জন্য সম্মানের কারণ হতে পারে।

৮৩। এমনটি কখনো হবে না। <sup>ষ</sup>এরা অবশ্যই তাদের <sub>১৭]</sub> উপাসনাকে অঙ্গীকার করবে<sup>১৯৯</sup> এবং তাদের বিরুদ্ধে ৮ দাঁড়াবে।

৮৪। তুমি কি জান না <sup>ণ</sup>আমরা কাফিরদের বিরুদ্ধে শয়তানদের ছেড়ে রেখেছি, যারা বিভিন্নভাবে তাদেরকে উক্খনী দিতে থাকে?

দেখুন : ক. ১৮:৩৫, ৭৪:১৩-১৪ খ. ৬:৯৫, ১৮:৪৯ গ. ২১:২৫, ৩৬:৭ ঘ. ৬:২৪, ১০:২৯ ঙ. ৮:৪৯, ৪:২৬, ৫৯:১৭

১৭৯৬। অবিশ্বাসী ব্যক্তি তার ধনসম্পদ ও সন্তানদেরকেই বেশী মূল্য দেয়। এই সবের জন্য সে গর্ব বোধ করে এবং পাশাত্যের গর্বিত জাতিগুলোও এইরূপ করে যাদের সম্বন্ধে বর্তমান সূরা বিশেষভাবে আলোচনা করেছে।

১৭৯৭। ‘কাল্লা’ (এরূপ কখনো হবে না) এর অর্থ এও হতে পারে যেমনও প্রত্যাখ্যান, তিরক্ষার, অসত্য বলার কারণে কোন ব্যক্তিকে মন্দ ভর্তসনা করা। এর মর্ম একপথ হয়, পূর্বে যা বলা হয়েছে তা ভুল এবং পরবর্তীটি সঠিক (লেইন)। ‘ইয়াকুলু’ (অর্থ সে যা বলেছে) শব্দ অবিশ্বাসীদের প্রশংশ্য পাওয়া অহঙ্কারপূর্ণ কথাবার্তার প্রতি ইঁহগিত করে যা তাদের ধনসম্পদ, শক্তি, প্রতাপ এবং সন্তানসন্ততির কারণে করা হয়।

১৭৯৮। ‘আর যা কিছুর কথা সে (সগর্বে) বলছে আমরা এর উত্তরাধিকারী হয়ে যাব এবং সে আমাদের কাছে একাকীই আসবে’ এই উক্তির অর্থ এও হতে পারেঃ তার সন্তান ও ধনসম্পত্তি সবই পিছনে ফেলে আসতে হবে, (ক) আমরা তার ঔন্দত্যপূর্ণ কথাগুলো সংরক্ষিত করে রাখবো এবং তা তাকে তখন স্মরণ করাবো যখন সে আমাদের সমীপে আসবে এবং এই জন্য তাকে শান্তি প্রদান করবো এবং (খ) তার উত্তরাধিকারীরা ইসলামের পতাকাতলে সমবেত হবে এবং তার সমস্ত ধন-সম্পদ আমাদের অর্থাৎ ইসলামের জন্য ব্যবহার করা হবে।

১৭৯৯। এই উক্তির অর্থ হতে পারেঃ (ক) মিথ্যা প্রতীকগুলো অঙ্গীকার করবে, মূর্তি উপাসকরা কখনো তাদের ইবাদত করেনি, (খ) প্রতিমা পূজারীরা অঙ্গীকার করবে, তারা কখনো মূর্তিগুলোরা উপাসনা করতো না। ‘ক’ অর্থের জন্য দেখুন ২১:৬৭; ১০:২৯; ১৬:৮৭; ২৮:৬৪; এবং ‘খ’ অর্থের জন্য দেখুন ৬:২৪; ৩০:১৪ আয়াতসমূহ।

أَفَرَءَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِاِلْيِتِنَا وَ قَالَ  
لَا وَتَيْنَ مَالًا وَذَلِكَ الْعِظَمَ

أَطْلَعَ الرَّغِيبَ أَمِ اتَّحَدَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ  
عَهْدًا<sup>(٤)</sup>

كَلَّا وَسَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَ تَمْدُ لَهُ مِنْ  
الْعَذَابِ مَدَدًا<sup>(٥)</sup>

وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَ يَا تَبَيَّنَا فَرَدًا<sup>(٦)</sup>

وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ إِلَهًا لَيَكُونُوا  
كَهْفِعِزًا<sup>(٧)</sup>

كَلَّا وَ سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَ يَكْنُونَ  
عَلَيْهِمْ ضَدًا<sup>(٨)</sup>

أَلَمْ تَرَ أَنَّا آزَسْلَنَا الشَّيْطَانَ عَلَى  
الْكُفَّارِ تَوْهِيْمًا<sup>(٩)</sup>

৮৫। সুতরাং তুমি তাদের ব্যাপারে তাড়াত্ত্ব করো না।  
আমরাতো তাদের প্রতিটি ক্ষণ গুণে রাখছো<sup>১৮০০</sup>।

فَلَا تَنْجِلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعْذِلَهُمْ عَدًّا

৮৬। (স্মরণ কর সেদিনকে) যেদিন ক্ষামরা মুন্তকীদের  
একে করে রহমান (আল্লাহর) দিকে একটি (সম্মানিত)  
দলরূপে নিয়ে যাব।

يَوْمَ رَخْشُ الْمُتَقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفَدًا

৮৭। আর পশ্চালকে যেভাবে পানির ঘাটে নিয়ে যাওয়া হয়  
সেভাবেই ক্ষামরা অপরাধীদেরকে জাহানামের দিকে হাঁকিয়ে  
নিয়ে যাব<sup>১৮০১</sup>।

وَتَسْوِقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وَزَدًا

৮৮। রহমান (আল্লাহর) কাছ থেকে যে ব্যক্তি প্রতিশ্রুতি নিয়ে  
রেখেছে কেবল সে ছাড়া অন্য কেউ সুপারিশের অধিকার  
রাখবে না।

لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ  
الرَّحْمَنِ عَهْدًا

৮৯। ক্ষামর তারা বলে, ‘রহমান (আল্লাহ) পুত্র গ্রহণ  
করেছেন।’

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا

৯০। নিশ্চয় তোমরা এক অতি জ্যন্য কথা বলছ।

لَقَدْ جُنُّتُمْ شَيْئًا

৯১। আকাশ ফেটে যাওয়ার, পৃথিবী টুকরো টুকরো হওয়ার  
এবং পাহাড়পর্বত খড়বিখড় হয়ে পড়ে যাওয়ার উপক্রম এ  
কারণে হয়েছে<sup>১৮০২</sup>

تَكَادُ السَّمُوتُ يَتَفَطَّرُ مِنْهُ وَتَنْشَقُ  
الْأَرْضُ وَتَخْرُجُ الْجِبَابُ هَذَا

৯২। যে তারা রহমান (আল্লাহর) প্রতি এক পুত্র আরোপ  
করেছে।

أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا

৯৩। অথচ কোন পুত্র গ্রহণ করা রহমান (আল্লাহর) মর্যাদার  
পরিপন্থী<sup>১৮০৩</sup>।

وَمَا يَنْتَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَخَذَ وَلَدًا

দেখুনঃ ক. ৩৯৪৭৪ খ. ৩৯৪৭২ গ. ২৪৪৯, ২০৪১০০, ২১৪২৯, ৩৪৪২৪, ৩৯৪৪৫, ৪৩৪৮৭, ৫৩৪২৭, ৭৪৪৪৯, ঘ. ২৪১১৭, ৪৪১৭২, ৬৪১০১-২,  
১০৪৬৯, ১৭৪১১২, ১৮৪৫, ১৯৪৩৬, ২১৪২৭, ২৫৪৩, ৩৯৪৫, ৪৩৪৮২ খ. ২৪১১৭, ৪৪১৭২, ১০৪৬৯, ৩৭৪১৫২-৫৫

১৮০০। এই আয়াতের মর্মঃ (ক) আমরা তাদের অসৎকর্মগুলোর পূর্ণ খতিয়ান রাখছি এবং (খ) আমরা হিসাব রাখছি কখন তাদের  
শাস্তির সময় আসবে।

১৮০১। ‘আল্ল বিরদ’ এর অর্থঃ (ক) পানির নিকট আসা বা পৌছা, (খ) সেই পানি যার নিকট পান করার জন্য কেউ আসে, (গ) পানির  
নিকট আসার পালা বা পানির দিকে আসার মোড় এবং (ঘ) উটের সংখ্যা বা পিপাসার্ত উটের দল (আকরাব)। আরও দেখুন ১১৪৯।

১৮০২। ‘ঈসা(আঃ) খোদার পুত্র’-এই ধর্মসত্ত্ব ভয়ঙ্কর যে আকাশ, পৃথিবী ও পর্বতসমূহ এই ভয়ংকর কথার জন্য ধ্বনে পড়তে  
চায়। এই বিশ্বাস আসমানী সন্তাসমূহের বিরোধী। কারণ এটি ঈশী গুণবলীর এবং তার দ্বারা যা কিছু সমর্থিত তাদের পরিপন্থী। (আল্ল  
আরয) পৃথিবীতে বসবাসকারী মানবের জন্য এই বিশ্বাস নির্দারণ ঘৃণা বা বিরক্তিপূর্ণ, কারণ তা মানববুদ্ধি বা মানবপ্রকৃতির উপরে  
আঘাত হানে এবং বিচার-বুদ্ধি এতে আড়ষ্ট হয়ে পড়ে। উচ্চ ও মহৎ আদর্শবান ব্যক্তিরা, যেমন নবীগণ এবং আল্লাহ তাআলার মনোনীত  
মহাপুরুষগণ (আর জিবাল) এই মত অঙ্গীকার এবং প্রত্যাখ্যান করেন। কারণ কোন ব্যক্তির উচ্চ মর্যাদা এবং নাজাত প্রাপ্তির জন্য  
অপর ব্যক্তি বদলীস্বরূপ ত্যাগ স্বীকার করার ধারণা তাদের নিজ আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার পরিপন্থী।

১৮০৩ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

৯৪। ﴿أَكَانُوا مِنْ أَنفُسِهِمْ أَعْذَّاً﴾  
 (আল্লাহর) সামনে বান্দারুপে উপস্থিত হবে না<sup>১৮০৪</sup>।

إِنَّ كُلَّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا أَتَى  
 الرَّحْمَنَ عَبْدًا<sup>১৮</sup>

৯৫। নিশ্চয় তিনি তাদেরকে ঘিরে রেখেছেন এবং তাদেরকে  
 পুরোপুরি গুণে রেখেছেন।

لَقَدْ أَخْضَبْنَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدَّاً<sup>১৯</sup>

৯৬। আর কিয়ামত দিবসে তারা প্রত্যেকেই তাঁর সামনে একা  
 উপস্থিত হবে।

وَكُلُّهُمْ أَتَيْنِهِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فَزَدَ<sup>২০</sup>

৯৭। নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে রহমান  
 (আল্লাহ) অবশ্যই তাদের জন্য গভীর ভালবাসা সৃষ্টি করে  
 দিবেন<sup>১৮০৫</sup>।

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ  
 سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدُّا<sup>২১</sup>

দেখুন : ক. ২০১১০৯

১৮০৩। এই সুরা খৃষ্টান ধর্মতের, বিশেষভাবে 'ঈসা (আঃ) খোদার পুত্র' এই মূল মতবাদের বিরুদ্ধে অত্যন্ত জোরের সঙ্গে স্পষ্ট ঘোষণা দিয়েছে যা থেকে তাদের অন্যান্য ধর্মবিশ্বাসগুলো উদ্ভৃত। বর্তমান এবং পূর্ববর্তী চার আয়াত উক্ত মতের নিদা ও খন্ডন করার উপর বিশেষভাবে জোর দিয়েছে। ঈসা (আঃ) এর খোদার পুত্রত্ব এবং এর অনুগামী ধর্ম বিশ্বাস সমূহের মূল ভিত্তিরূপে প্রায়শিকভাবে মতবাদ ঐশ্বী গুণ 'আর রহ্মান' এর প্রতি অস্বীকৃতি জাপক এবং যেহেতু অত্র সুরার মূল বিষয়বস্তু উক্ত ধর্মতের খণ্ডন সেহেতু এই সিফ্ত বা গুণ অপরিহার্যভাবে বারংবার উল্লেখিত হয়েছে। প্রায়শিকভাবে মধ্যে রয়েছে, খোদা ক্ষমা করতে পারেন না, অথচ 'আর রহ্মান' গুণের মধ্যে নিহিত রয়েছে, তিনি ক্ষমা করতে পারেন এবং প্রকৃতপক্ষে কার্যক্ষেত্রে প্রায়শ মানুষকে ক্ষমা করে থাকেন। এই কারণেই এই সুরাতে বার বার 'আর রহ্মান' এর পুনরাবৃত্তি হয়েছে।

১৮০৪। আল্লাহ পরম করুণাময়, অযাচিত অসীম দাতা। তাই তার সাহায্যকারী বা উত্তরাধিকারী পুত্রের প্রয়োজন নেই। তিনি আকাশসমূহের ও পৃথিবীর প্রভু-প্রতিপালক এবং তাঁর সর্বাধিপত্য সমগ্র বিশ্বময় বিস্তৃত এবং সকল মানব তার দাস এবং ঈসা (আঃ) তাদেরই একজন।

১৮০৫। এই আয়াতের অর্থ নিম্নলিখিত যে কোনটা হতে পারেঃ (ক) মু'মিন ব্যক্তির অন্তরে আল্লাহ তাআলা তাঁর ভালোবাসা কীলকের ন্যায় প্রোথিত করে দিবেন, (খ) মু'মিনের জন্য তার অন্তরে প্রগাঢ় ভালবাসা কীলকের ন্যায় গেড়ে দিবেন, (গ) আল্লাহ তাআলা মু'মিন লোকের অন্তরে মানবজাতির জন্য গভীর ভালবাসা কীলকের ন্যায় গেড়ে দিবেন এবং (ঘ) তিনি মানুষের হন্দয়ে মু'মিন লোকদের জন্য গভীর ভালবাসা কীলকের ন্যায় সৃষ্টি করবেন।

৯৮। সুতরাং নিচয় আমরা ক্ষেত্রে (কুরআনকে) তোমার ভাষায় সহজ (করে অবরীণ) করেছি যেন তুমি এর মাধ্যমে মুত্তাকীদের সুসংবাদ দাও এবং বাগড়াটে জাতিকে এর মাধ্যমে সতর্ক কর।

৯৯।<sup>১৬]</sup> আর আমরা তাদের পূর্বে কত প্রজন্মকেই ধরংস করে দিয়েছি! তুমি কি তাদের একজনেরও অস্তিত্ব অনুভব কর অথবা তাদের পদধ্বনি শুনতে পাও<sup>১৮০৬</sup>?

فَإِنَّمَا يَسْرُئِيلَ يُلِسَّأَنَّكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ  
الْمُتَقِّيِّينَ وَتُنْذِرَ بِهِ قَوْمًا لَدَّا

وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنَاءِ هَلْ  
تُحِسْ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَشَمَّعُ لَهُمْ  
رِحْكَارًا

দেশুন : ক. ৪৪৪৫৯, ৫৪৪১৮ খ. ১৭৪১৮, ১৯৪৭৫, ২১৪১২, ৩৬৪৩২, ৫০৪৩৭

১৮০৬। এই আয়াত পাঞ্চাত্যের খৃষ্টান জাতিগুলোর জন্য এক তয়াবহ দুর্ভাগ্যের কঠোর হিশিয়ারী, যদি তারা পাপের পথ পরিহার করে সত্য গ্রহণ না করে। তাদের পার্থিব শক্তি ও সম্পদের জন্য এবং তাদের জাগতিক উন্নতি ও অগ্রগতির জন্য তারা গর্বিত। কিন্তু আন্ত বিশ্বাস এবং পাপাচারী জীবন যে ধরংসের পথে পরিচালিত করে এই প্রকাশ্য সত্যকে তারা উপেক্ষা করে চলছে।